মনে-মনে

প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রণীত

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা



মনে-মনে

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ, ১৩৪৮

দাম এক টাকা

প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার,

ডি. এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর : আশুতোষ ভড়, শক্তি প্রেস

২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

প্রমথ-জয়ন্তী উপলক্ষে—

বাঙ্গলা সাহিত্যের মন্ত্রী

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

রবীন্দ্র-মৃত্যুতিথি
ঝুলন পূর্ণিমা
শ্রাবণ ২২, ১৩৪৮

প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই

—উপন্যাস—

জীবন-মৃত্যু
আঁকাবাঁকা
আলো আর আগুন
জয়ন্ত
নববোধন
নদ ও নদী
দেবীর দেশের মেয়ে
স্বাগতম্
অগ্রগামী
ঝড়ের সঙ্কেত
নবীন যুবক
ঘুমভাঙার রাত
সরল রেখা
প্রিয় বান্ধবী
কাজল লতা

—গল্প—

পঙ্কতীর্থ
কয়েক ঘণ্টা মাত্র
বন্যাসঙ্গিনী
তরঙ্গ
অঙ্গরাগ
নিশিপদ্ম
দিবাস্বপ্ন
অবিকল
চেনা ও জানা

—ভ্রমণ কাহিনী—

ইতস্ততঃ
মহাপ্রস্থানের পথে
দেশ দেশান্তর
অবণ্যপথ

—চিত্রোপন্যাস—

আগ্নেয়গিরি
সায়াহ্ন
রঙীন সুতো
কলরব
তরুণী সঙ্ঘ
যাযাবর

—প্রবন্ধ—

মনে-মনে

মনে মনে

উইপোকা

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কাগজের জন্য যে গল্পটা লিখেছিলাম তার পাণ্ডুলিপি উইপোকায় কেটে নষ্ট করেছে খবর পেলাম। অবস্থা বিপাকে নতমস্তকে দুর্যোগের গুন টেনে চলেছি, এমন অবস্থায় এই সুসংবাদে আন্তরিক আনন্দলাভ করলাম। উইপোকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিজের ব্যর্থ রচনার চেহারা ছাপার অক্ষরে দেখে দেখে যে সকল লেখক লজ্জা বোধ করেন আমি তাদের ভিতরে একজন। উইপোকা সেই চরম লজ্জা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিল। বিশেষজ্ঞরা নাকি বলেন, ছাপা গ্রন্থের চেয়ে পাণ্ডুলিপির উপরেই উইপোকার একাগ্র লক্ষ্য। সেই শুভদিন কবে আসবে যেদিন আমার প্রকাশকগণের দোকানে আপনার উইপোকার দল বাসা বাঁধবে?

উইপোকা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানব সভ্যতার এই ভরা যৌবনকাল অবধি। যুদ্ধ চলেছে অক্লান্ত অবিশ্রান্ত—এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের অপেক্ষাও প্রলয়ঙ্কর, ইউরোপীয় মহাসমরের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। মানুষের সৃষ্টিশালার বিরুদ্ধে উইপোকার

ধ্বংসলীলা। এই সৃষ্টি ও সংহারের জন্যই মানুষের সমাজে এত স্বাস্থ্য, এত সুনাম, এত গৌরব। নৈলে স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জের ভারে সমগ্র জগৎ নিশ্বাস রোধ ক'রে ম'রে যেত। মানুষের জীবনপ্রবাহের যে ইতিহাস, তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে উইপোকা। কেবলই সে কাটছে, নষ্ট করছে, ধ্বংস করছে—করছে ব'লেই নব নব জন্ম, নব নব উদ্ভাবনা, নব নব রচনা। কত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কত শিল্পী, কত সাহিত্যিক, কত রাজা ও কত সাম্রাজ্য-ইতিহাস—উইপোকা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছে একা।

উইপোকা আপন দুর্গ রচনা ক'রে চলেছে আপন পথে পথে। তার ঐশ্বর্য নেই, তার শিক্ষা নেই, তার কোনও উপকরণ নেই; সে চিরদরিদ্র, চিরউলঙ্গ, কোটি কোটি উইপোকা চিরকালীন সংগ্রামে প্রাণদান করেছে মানুষের হাতে, তবু তারা নত হয়নি, বশ্যতা স্বীকার করেনি, ভুলে যায়নি মানুষের সঙ্গে তার চির-বৈরীতা, অথচ নীরবে নিঃশব্দে অবিনশ্বর উদ্দীপনায় মানুষের বিরুদ্ধে সংহার ও সংগ্রাম চালিয়েছে। পৃথিবীতে আজ অস্ত্র প্রয়োগের প্রতিযোগিতায় সকল জাতিই মেতে উঠেছে, কিন্তু সকল অস্ত্র একত্র করলেও উইপোকার বিরুদ্ধে তার লড়বার শক্তি হবে না। উই-পোকাদের আছে গণতন্ত্র, তাদের সমাজে রয়েছে

পারস্পরিক পরম ঐক্য, তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে সাম্রাজ্যবাদী মানুষ চিরলাঞ্ছিত। বাল্যকালে উইপোকার দিকে ভীত চক্ষে চেয়ে থাকতাম। পুরণো বাড়ীর প্রাচীন কড়িকাঠে ছিল উইপোকার বাসা। সাপের মতো দীর্ঘ অসংখ্য বাহু দিয়ে তারা কঠিন আলিঙ্গনে দেয়াল ও কড়িকাঠকে তিল তিল ক'রে গ্রাস করতো। প্রতিদিনের প্রতিপলের সেই ক্ষুধা ধ্বংস করেছে মানুষের কীর্তি। তাদের সেই অগণন দীর্ঘ বিলম্বিত জটাজটিলতা যেন মহাকালের চেহারাকে স্মরণ করিয়ে দিত। তাদের সেই রাহুগ্রাস থেকে নিজের জীর্ণ আশ্রয়কে আমি মুক্তি দিতে পারিনি, আমার অসহায় চক্ষুর উপর দিয়ে তারা আমার সর্বনাশ ক'রে গেছে। এই উইপোকার বাসা জীবনে জীবনে, প্রাণের মূলে, কল্পনার স্তরে স্তরে, চিন্তা ও ভাবনার পাকে পাকে। প্রাণকে, দেহকে, যৌবনকে, উৎসাহ আর অধ্যবসায়কে এই উইপোকা জীর্ণ করছে মুহূর্তে মুহূর্তে,—কেবলই মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। যেখানে জরা, যেখানে অনাদর, যেখানে ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষয়ক্ষীণ জীবন, যেখানে পুরাতনের অনাবশ্যক জটলা, যেখানে অগ্রগতিশীল সৃষ্টির পথে অচল ও অটল বাধা,—উইপোকার বিপুল শক্তি সেই জরাজীর্ণ জড়ত্বকে বিনাশ করতে ছুটে যায়। উইপোকা চরম শত্রু, উইপোকাই পরম বন্ধু ।

উইপোকার হাতে অণু-পরমাণু সৃজনের ভার। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ, এই জীবজন্তুময় প্রকৃতির কারখানার যত কিছু মালমশলা, এই জড় ও গতিশীল গ্রহ-উপগ্রহের আদিতত্ত্ব—এদের সাক্ষী উইপোকা।

আপনি দুঃখিত, আমি আনন্দিত। আপনার বেদনা ও আমার উল্লাসের মধ্যপথে উইপোকা যে-সেতু রচনা করেছে সেটা ওই ধাবমান মহাকালের আদিম নিয়মে। উইপোকা আমার গল্পের পাণ্ডুলিপিকে নূতন বিশ্বসৃজনের কাজে লাগিয়েছে, সেই গৌরবে আমি হবো অমর। আমি জানি এই চিঠিখানাও সেই পরম প্রয়োজনে লেগে যাবে। ইতি—

স্টীমারের ডেক্

মাত্র চব্বিশ মাইল জলপথ। আমাদের স্টীমার চলেছে মন্থর গতিতে। যাত্রীর সংখ্যা অল্প, নিকটে ও দূরে ডেক-এর উপর জনকয়েক ছড়িয়ে শুয়ে নিদ্রামগ্ন। রাত্রিশেষের একটা আভাস পূর্ব গগনে দেখা দিচ্ছে অল্প অল্প। চেয়ে দেখছি স্টীমারের দোলার সঙ্গে আকাশের অগণ্য নক্ষত্র টলটল করছে। ওদের নিঃশব্দ আলোকবিন্দুগুলি আমার মুখে ছায়া ফেলছে ক্ষণে ক্ষণে। আমার উড়ো চিন্তার ওরা নির্বাক শ্রোতা।

আলাপ একটা চলছে নিজের সঙ্গে। নদীর উপরে তরঙ্গ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, উৎক্ষেপ নেই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার আছে একটা কল্লোল, নিজের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া। যাকে বলে গতি তার সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। বাইরের পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গে আমার প্রাণের আছে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তা, সেই কথাটা জলের উপর দিয়ে যেতে যেতে যেমন অনুভব করি এমন আর কিছুতেই না। আমার স্থির থাকার উপায় নেই এইটিই সত্য, দাঁড়ালেই থেমে যেতে হবে, ক্লান্তি এলেই চরম অপমৃত্যু।

অনেক সময়ে অনুভব করেছি,—যেমন এই রাত্রি শেষের আকাশ আমার কানে কানে অনেক সময়ে অদ্ভুত ভাষায় কথা কয়,—আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা অন্ধ, নিগূঢ় চৈতন্য ধক ধক করে। বলে—সময় নেই, সময় নেই, তোমাকে শেষ করতে হবে সব। এই আত্মতাড়না দেয় আমাকে গতি, ছুঁইয়ে দেয় অনন্ত আশার স্পর্শ, দুই পায়ে এনে দেয় অফুরন্ত প্রাণশক্তি। মানুষের সকল কাজের পিছনে কেবল কি আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মপ্রকাশের ব্যগ্রতা? হয়ত এমন হতে পারে, মৃত্যুভয়ই মানুষকে সকল কর্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত করে—কে জানে।

নির্জনতা আমার প্রিয়, কিন্তু কবিজনোচিত নির্জনতা নয়। মানুষকে এড়িয়ে, জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কোনো একটা নিরুদ্দেশ নির্জনতা নয়,—বিপুল জনতার দলাদলির ভিতরে নিজেকে একান্ত ক'রে দেখি, আমি জনহীন। বন্ধুদের আড্ডায়, রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে, সংবাদপত্রের আপিসে, সাহিত্যসভার কচকচির মধ্যে আমি বারম্বার অনুভব করেছি অতিশয় একাকী, আমি যেন তখন আপন প্রাণের দর্পণেই নিজের প্রতিফলিত চেহারাটার দিকে একান্তভাবে চেয়ে থাকি। দেখেছি, আমি যা চাইনে তাই আমার হাতে আসে, যাকে সহ্য করতে পারিনে তার কাছেই কাজকর্মের আদানপ্রদান,



যে কাজকে অপছন্দ করি সেই কাজেই দিন কাটে, এবং যেখানে যেতে মন চায় না—মনের অগোচরেই আমাকে সেখানে উপস্থিত হতে হয়।

নিজের সত্য পরিচয়? কিন্তু সে কি আমার কৃত-কার্যের মধ্যে পাওয়া যাবে? আমার পরিত্যক্ত স্তূপীকৃত কর্মসম্ভার কি আমার সত্য পরিচয়ের উপকরণ? আমি নিজে যেন কোন্ এক প্রতিভাশালী গ্রন্থকারের পাকা হাতে লেখা একখানা কাঁচা উপন্যাস। বিষয়বস্তুটা মন্দ ছিল না, গল্পের প্রবাহটাও ছিল প্রচুর কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গীর ত্রুটিতে হয়ে গেল সব মাটি। আমি যা হতে চেয়েছিলাম অথচ হয়ে উঠতে পারিনি সেই আমার সত্য রূপ—এ কথা কেউ অস্বীকার করবে? একটা আইডিয়ার মধ্যে, হৃদয়-স্বপ্নের মধ্যে আমার সত্য মানুষটা বাস করে, কিন্তু জগৎ-সংসারের অসংখ্য অসঙ্গতির মাঝখানে সে যখন এসে দাঁড়ায় তখন তার নকল পোষাকটার ভিতর দিয়ে সত্য চেহারাটাকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। হয় সে তখন নিজেকে গোপন করে, নয়ত বা আত্মপ্রকাশের পদ্ধতিকে সে জটিল ক'রে তোলে।

কথার পর কথার মালা গেঁথে চলেছি নির্জনে। শব্দের পর শব্দ, কোটি কোটি প্রাণহীন অক্ষর—নির্বোধ নির্বাক নিশ্চল অক্ষরের অরণ্য, সমুদ্রের অগণ্য ঝিনুকের

মতো,—কিন্তু নির্মমভাবে নিজেকে জানতে পারিনি, নিরাসক্ত হয়ে নিজেকে জানাতেও পারিনি। কেন? কোথায় আছে নিষেধ? কোথায় ঘরগড়া নীতির বাধা?

অনেকটা যেন অজানার দিকে যাত্রা। সঙ্কীর্ণ নদীপথ,ঊষার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পাচ্ছি আঁকাবাঁকা নদীপথের দুই তটে গ্রামের পর গ্রাম,—কোথাও ভগ্ন তটের বাঁক, কোথাও প্রাচীন বটের শিকড়ের ভিতরে নদীর প্রবাহ প্রবেশ ক'রে ক্ষয় ক'রে এনেছে। কোথাও এরই মধ্যে গ্রামের দুই একটি নরনারী নদীতে অবগাহন সুরু করেছে। দেখতে দেখতে প্রভাতের রক্তিম আলো আকাশে ফুঠে ওঠে।

এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, প্রত্যহের জীবনযাত্রায় যে পৃথিবী রূপকের রাজকন্যার ন্যায় রূপ ও ঐশ্বর্য নিয়ে চোখ মেলে জেগে উঠেছে, আমি যেন তার একমাত্র দর্শক। আমি বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত, বর্তমানের সমস্ত দৃশ্য-বস্তুকে ছাড়িয়ে আমি যেন অতি দূরে স'রে আছি। এই স্টীমার, এই নিদ্রিত যাত্রীর দল, দূরে ওই গ্রামের পর গ্রাম, প্রভাতী পাখীর বন্দনা-গান, অস্পষ্ট নদীর রেখা—সমস্তই স্বপ্নবৎ, সমস্তই যেন আমার মনশ্চক্ষের সৃষ্টি। আমি এদের সকলকে নিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট পথে, কোন্ অজানা জীবন ও মৃত্যুর দিকে যাত্রা করেছি,



কোন্ পরম পরিণতির দিকে। আমি যেন এদের পথপ্রদর্শক, এদের ভাগ্যবিধাতা।

জীবনযাত্রার অর্থ কি? জীবনের সমস্ত উপকরণ নিয়ে মহাজীবনের দিকে যে-অভিযান তাকেই বলবো মানুষের পরমায়ু। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, দেশ থেকে মহাদেশ, সহস্র জনপদ, অগণ্য নদীপথ, তুষারাচ্ছন্ন গিরিশিখর, নরখাদকের রাজ্য, হিংস্র শ্বাপদের অরণ্য, অনাবিষ্কৃত মেরুদেশ,—তারপরে আরো দূরে, হারিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া,—একটা অনাস্বাদিত বন্য বর্বর জীবন। জীবনযাত্রা কি এর নাম নয়?

ইতিহাস তাদেরই জন্য, যারা কেবলমাত্র বাঁচেনি, কেবলমাত্র মরেনি। ঈশ্বরের রাজটীকা কপালে নিয়ে জন্মেছে তারা, যারা গোমুখীর মুখ থেকে উৎসারিত হয়ে জনপদ প্লাবিত ক'রে ছুটে চ'লে গেছে গঙ্গাসাগরের দিকে। ঘরগড়া নীতির যারা দাসত্ব করেনি, সমাজপতির ভ্রূকুটি যাদের বিজয়যাত্রার পথকে কণ্টকিত করেনি, চলিত অবস্থার দাসত্বকে যারা স্বীকার ক'রে নেয়নি। অন্তত আমার মতো, যারা কোনো হৃদয়বৃত্তিকে আমল দেয়নি, বৈরাগ্য যাদের রক্তে, যারা মানুষের নির্বোধ আদর্শের দিকে চেয়ে কেবল হেসে যায়। অন্তত আমার মতো যাদের মনে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির উপর আধিপত্য করার কল্পনা।

মনে-মনে

স্টীমার ভেসে চলেছে, পৃথিবী হেসে চলেছে। নদীর দুই তীরে বাংলার গ্রাম্য জীবনের একটি সরল স্বভাব-সৌন্দর্য।

আমি ব'সে ব'সে ভাবছি প্রভাত আকাশের দিকে চেয়ে। আমি ভাবছি আমার পথ যেন কোনদিন না ফুরোয়। স্টীমার হেলে দুলে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলেছে,—আর আমি চেয়ে রয়েছি আমার ভিতরকার নদীর অনন্ত তরঙ্গভঙ্গের দিকে।

আমি চেয়ে রয়েছি প্রভাত সূর্যের দিকে, ডুবে গেছি আকাশগঙ্গায়।

নতুন বছর

ইংরেজী নতুন বছরের প্রথম দিনটি যেন অখণ্ড সম্পূর্ণতার সহচর। তখন ঘরে ঘরে ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর সমাবেশ, শীতের স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে মানুষ তখন সজীব, শাক-সব্জী শস্যে চারিদিক পরিপূর্ণ; অভাব, রোগ, কৃপণতা, অবসাদ কোথাও কিছু নেই। ইংরেজী নতুন বছরের সঙ্গে আসে আয়ু, শ্রী, শক্তি ও কর্মোৎসাহ। আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, সম্ভোগে তখন কারো ক্লান্তি অথবা নিরাসক্তি নেই। জীবন-চাঞ্চল্যে আর প্রাণের প্রাচুর্যে ইংরেজী নতুন বছরের দিনটি ঝলমল করে।

কিন্তু ভারতীয় নতুন বছরের যে পয়লা বৈশাখ তার অন্য রূপ। আমাদের নববর্ষের দিনটি আসে যখন অবসন্ন বসন্তকাল তার শেষ বিদায়ের উষ্ণ নিশ্বাসটি ফেলতে থাকে। আকাশের নীলিমা গেছে কমে, বায়ুর আর স্নিগ্ধতা নেই, ফুলদলের সমারোহ শেষ হয়ে গেছে, নদীতে জলধারা শীর্ণ, তড়াগ-পুষ্করিণী শুষ্কপ্রায়, ক্ষেতে শস্য নেই, গাছের কাঁচা ফলে তখনও মাধুর্য আসেনি। যতদূর চেয়ে দেখি প্রান্তর ও জনপদ রিক্ত, কৃপণ, শূন্যময়। বৈশাখের আকাশ উপরে কাংস্যপাত্রের ন্যায় দপ দপ ক'রে জ্বলে, তার নীচে

রুক্ষকেশা ভৈরবীর ন্যায় প্রকৃতি জলচিহ্নহীন প্রান্তরে মুদিত চক্ষে ধ্যানাসীন। আমাদের নতুন বছরের কোনো শ্রী নেই, উৎসাহ নেই, বরং অস্বাস্থ্যে, দারিদ্র্যে, মহা-মারীতে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে ভীষণাকার।

এর কারণ অস্পষ্ট নয়। নতুন বছর বলতে আমরা জীবনেরও একটি নবীনতা ও নবচেতনা বুঝি। নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে আমরা ফিরে যাই সৃষ্টির আদিম অবস্থায়, কল্পারম্ভে। হয়ত তখন শস্যশূন্য প্রান্তর এমনি রিক্ত ও নিঃস্ব ছিল, তখনও ফুল, ফল, শস্য, সব্জি এসে পৌঁছয়নি। আমরা সেই অভাব আর শূন্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নবজীবনের জন্য প্রার্থনা জানাই। এই প্রার্থনার পরে ফলে এসে সঞ্চারিত হয় রস, আকাশ থেকে বর্ষণ এসে মৃত্তিকাকে জীবন্ত করে, প্রাণীন খাদ্যের বীজ অঙ্কুরে রূপান্তরিত হয়,—একদিন লক্ষ্মী ঘরে ওঠেন। জীবনের চেহারাও এমনি। মানুষ জন্মগ্রহণ করে রিক্তহস্তে, সকলশূন্য অবস্থায়। ধীরে ধীরে তাকে কেন্দ্র করে একটি জগৎ সৃষ্টি হয়। আমাদের নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে এত নবীনতা আছে বলেই তার এত অভাব, এত রিক্ততা; তাকে বৃহৎ পরিমাণ সৃষ্টি করতে হবে বলেই সে এমন সর্বস্বান্ত।

আমরা সাধারণ মানুষ সহজ দৃষ্টিতে দেখি

মনে-মনে

প্রাণান্তকর উত্তাপ আর অবসাদের মধ্যে নতুন বছর আরম্ভ হোলো। এক একটি বছর আমাদের ক্ষয় আর ক্ষতির ইতিহাস। পৃথিবী চলেছে সেই পুরণো চালে; মানুষের ভিতরে সেই হিংসা ও ক্রুরতা; শয়তান তেমনি রাজবেশ পরে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধ বেধেছে, জাহাজ ডুবছে, মানুষ মরছে, রাজ্য লোপাট হচ্ছে— কিন্তু মহাযুদ্ধের অপেক্ষাও বড় যুদ্ধ আছে—সে যুদ্ধ আমাদেরই জীবনে। ছোট আঘাত, ছোট অপমান, ছোট ছোট মহত্ত্ব ও মহিমার আত্মবলি,—কিন্তু তার ইতিহাস অনেক বড়, তার সংগ্রামের রক্তপাত পরিমাণে অনেক বেশী এবং তাদের ঘিরে যে মহাকাব্য তৈরী হয়, মানবতার আদি অন্ত ইতিহাসের পাতায় অতখানি উৎপীড়ন ও রক্তক্ষরণের কাহিনী বোধকরি কোনো-দিনই লেখা হয় নি।

সেই কারণে প্রতি নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে আমাদের উৎসুক কল্পনা একটি নবজীবনের প্রার্থনা নিয়ে সুদূর দুরাশার দিকে ধাবিত হয়।

রামগড় থেকে রাঁচী

বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ ক'রে আমাদের মোটর চলেছে দ্রুত গতিতে। পথের দুইধারে দূরান্তরের প্রান্তরে-প্রান্তরে নতুন বসন্তকাল মায়া বিস্তার করেছে। এপাশে ওপাশে ছবির পর ছবি ফুটছে, আবার পিছিয়ে পড়ছে নতুন ছবির আবির্ভাবে। দ্রুতগতির দোলায় দুলছে মন, দুলছে আমাদের কল্পনা।

শালের জঙ্গল পেরিয়ে একটি পায়ে চলা পথ কোথায় যে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ সেইদিকে চেয়েছিলুম। সময় ও দূরত্ব মনেরই বিকার,—অভ্যস্ত মন নিয়ে ওদের অস্তিত্বকে স্বীকার করি মাত্র; যে-কাল অনন্ত, যার আদিও নেই, সে কেবল আমাদের মনের একটি পলকের ইতিহাস। পথটি হারিয়ে গেল,—যেমন চোখে চোখে যাকে রাখি বড় সহজে সে হারায়। কাল ও প্রসার কেবল মনেরই নাকি অনুভূতি।

কাঁকর আর পাথরে ভরা মাঠ,—তারই তরঙ্গায়িত চিত্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে কল্পনা, পিছনে পিছনে চলেছে বৈরাগী প্রাণ,—নিত্যবৈচিত্র্যের ঘন আস্বাদে ক্ষুধা যার মেটে না। অদূরের নীলাভ

পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশ নীল, তার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্যের তাম্রপাংশুল অগ্নিরশ্মির ফলায় বায়ুমণ্ডল ছিন্নভিন্ন হচ্ছে,—আর বাতাসে চৈত্রমাসের ঘুমজড়ানো আতপ্ত নিশ্বাস। আমাদের মোটর রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে।

ট্রেনে অথবা মোটরে দেশদেশান্তর অতিক্রম করা চলে, চোখবুলানো অনুভূতি একটা আয়ত্ব করা যায়,—কিন্তু ভ্রমণ তখনই সার্থক যখন তার গতি মন্থর। তখন আমরা কেবল দেখেদেখে পথ হাঁটিনে, কিছু পেতে চাই, সংগ্রহে আমাদের মন ভ'রে ওঠে। ভ্রমণকে অবকাশময়, কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বভার মুক্ত, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন না করলে তার স্মৃতি থেকে রস টানা যায় না। সেই জন্য কন্‌সেসন টিকিটে বায়ুপরিবর্তন হয়, কিন্তু ভ্রমণ হয় না।

ঢেউ খেলানো পথ বললে হয়ত ছবি ফোটে না, সম্মুখের পৃথিবীর পথ যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আমাদের মোটরের আগে আগে চলেছে। গাড়ীর গদির গর্ভে সেই তরঙ্গ-দোলায় যেন মদির স্বপ্ন কুমারীর প্রাণকোরকের মতো উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। জানি এ কল্পনা অলস, তবু নিরুপায় প্রশ্রয়ে পথে পথে মন মোহগ্রস্ত। নিকটে দূরে কোথাও গ্রাম দেখা যায় না, জনমানব কোথাও নেই, চারিদিকের পার্বত্য প্রান্তর ধূ ধূ নির্জন

—দূর শূন্য থেকে মাঝে মাঝে উড্ডীন কোনো কোনো যাযাবর পাখীর আর্তরব,—মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় যে আদিম বন্যতা ছিল এদিকে যেন তার পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের মোটর চলেছে রাঙা পলাশের বন্যা পেরিয়ে। এখন বসন্তকাল।

ছোট ছোট পাহাড়ের কপাল বেয়ে নেমেছে বাসন্তী রংয়ের অজস্র ধারা, অরণ্য তার রহস্যের আবরণ তুলে ধরেছে ঋতুরাজের পথে, তারই সঙ্গে চৈত্রের ফুৎকারে ঝারাপাতার ঝরো ঝরো শব্দে বাতাস চলেছে আঁচল উড়িয়ে। পলাশের লালে দিগন্তজোড়া প্রান্তরে আগুন ধরেছে। কৃপণের মতো এই উপত্যকাময় প্রান্তর এই সেদিন ছিল রিক্ত, রুগ্ন অরণ্যের শাখা প্রশাখায় নিষ্পত্র নির্জীবতা দেখে গেছি, আজ ঋতুর অজস্রতায় তার শত হাত অকুণ্ঠ প্রসারিত। বসন্তে এসেছে রং, বর্ষায় আসবে রস।

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই ঋতুর বিবর্তন চোখে পড়ে। সমুদ্রের কল্লোল যারা শোনাতে পেরেছিল, তাদের মন মরুভূমির বালুচড়ায় এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হলকর্ষণ নেই, চাষ চলছে না, সার পদার্থের অভাব, বীজবপন নেই, দিকে দিকে নতুন ফসলের দুর্ভিক্ষ। পুরণো ধান যা গোলাজাত হয়েছিল তাই খরচ ক'রে চলা। নতুন সাহিত্য এখন বসন্ত আর বর্ষা অতিক্রম

ক'রে এসে শীত ঋতুতে প্রবেশ করেছে। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। যুগের যে দ্রুততা তার ভিতরে মানুষের মনের স্থিরতা নেই, স্থিতিশীলতা নেই। এই সেদিন পর্যন্ত যে সমাজ-চেতনা চলিত ছিল, সেখান থেকে চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভাঙা মোটরগাড়ীর ঝর-ঝরে অবস্থার মতো সমাজ-শৃঙ্খলাটা হয়ে উঠেছে হাস্যকর। যৌথ-জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কল্পনায় চিন্তাধারা উগ্র। আগে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থাৎ তথাকথিত সমাজে একটা যা হোক নীতি ও শৃঙ্খলা ছিল,—এবং তার একটা সুস্পষ্ট আকার ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা রস সাহিত্যের পক্ষে সহজ হোতো। আগে যৌথ-জীবন প্রণালীবদ্ধ ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে সাহিত্যে লাঠালাঠি করা বেমানান হোতো না।

দিগন্তশয়ান অতিকায় সরীসৃপের মসৃণ পৃষ্ঠের মতো পথে ধাবমান মোটরের ভিতর ব'সে চৈত্রের আতপ্ত হাওয়ায় চোখে নামছে তন্দ্রা। সাহিত্যের কথাই ভাবছিলাম। সম্প্রতি যে-নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে তাকে কি আলস্য বলা চলে? ফল্গুনদীর উপরভাগে তরঙ্গ নেই, বালুরাশিতে সে ঢাকা, কিন্তু তার অন্তর নিরন্তর চলেছে অভিজ্ঞতার পথ ধ'রে বিস্ময় থেকে বিস্ময়ে। সাহিত্যের এক এক যুগ কখনো

অন্ধকারে হাতড়ায়, কখনো বা আলোয় দিশেহারা হয়। আপাত নিশ্চলতার ভিতর দিয়ে সঞ্চয় আর সংগ্রহ চলেছে অবিশ্রান্ত, স্রষ্টামন কখনো ব'সে থাকে না। আজ যাকে মরুভূমি ব'লে ভুল করছি, প্রাণক্ষেত্রের ভূ-তাত্ত্বিক নিয়মে আগামীকাল তাই হয়ে উঠবে রসপ্লাবিত সমুদ্র।

সন্দেহে, অবিশ্বাসে, অশ্রদ্ধায় পৃথিবীর চেহারাটা দুঃখবাদে ধূসর। নতুন সৃষ্টি নেই, কিন্তু দিকে দিকে প্রচলনের বিপক্ষে বিপ্লব আর ভাঙন। কিন্তু তা হোক, আমাদের এই নবগঙ্গার তীরে তীরে যদি আশাবাদের স্বপ্ন দেখি সে কি হবে এতই বড় বিদ্রূপের বস্তু? দুঃখবাদের ভিতরে দেখি বিপুল মরণের ছায়া, তার ক্ষয়ক্ষীণ হতাশার দিকে চেয়ে থাকলে ভয় করে, সে বিপ্লব যেন আত্মদ্রোহিতা,—সৃষ্টি সেখানে বন্ধ্যা। বাঁচবার উপকরণ যদি পাই, যদি কল্পনাকে সজীব আর ঐশ্বর্যময় করে তোলে তবে আশাবাদ মন্দ কি? আশাবাদের সহচারী হোলো গতিশীলতা, সহকারী হোলো নতুন অধ্যবসায়। সাহিত্যের তলায় রয়েছে চিত্তবিপ্লব কিন্তু সে যেন কালবৈশাখীর ঝড়ঝঞ্ঝা, তারপরে আসবে নব আষাঢ়ের বর্ষণ।

কথা সাহিত্যে পদ্ধতি আর প্রকাশের বৈচিত্র্য এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গল্পটা সেই পুরণো। এ যেন

নতুন থালায় বাসি ভাত খাওয়া। বাইরেটা নিয়ে হৈ চৈ করা, কিন্তু তার ভিতরে প্রাণীন পদার্থ নেই। এ কেন? এর কারণ যে-জীবনটা জানি তারই পুনরাবৃত্তি বারম্বার চোখে পড়ছে, আজ আমাদের সমাজে এক মানুষ অপরের অনুকরণ। সাহিত্যের গতিশীলতা বাধা পাচ্ছে বলেই প্রগতি সাহিত্য নিয়ে এত চীৎকার। সাহিত্যিকরাএকদিন তাদের পায়ে শিকলের সুদৃঢ় বন্ধন অনুভব করেছিল, সেই শৃঙ্খল চূর্ণ হবার শব্দ পেয়ে আমরা হাততালি দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর দেখা যাচ্ছে পায়ের শিকল কাটলেও সদর দরজায় সরকারী শিলমোহর আঁটা। ভিতরে হোলো সমাজ বিদ্রোহ, বাইরে হোলো মুক্তি আন্দোলন। আজ সাহিত্যিকদের মন ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত। কেউ ফেলছে অশ্রু, কেউ মাথা ঠুকছে বার বার, কেউ উচ্চকণ্ঠে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছে, আবার কেউ বা রাঙ্গায় চোখ। বিশ্ব-যাত্রার ক্ষুধা যখন জাগলো, শক্তি যখন আয়ত্ব করা গেল, তখনই হোলো সকল পথ রুদ্ধ। জীবনের বহুমুখীনতা বাইরে থেকে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে কিন্তু বাহির হবার পথ নেই।

উচ্চ মালভূমি পেরিয়ে আমাদের মোটর অরণ্য উত্তীর্ণ হয়ে নিচের দিকে নামছে। বাঁ দিকে উচ্চ অরণ্যময় পার্বত্য ভূভাগ আর দক্ষিণে শত শত হাত

নিচে বিশাল সমতল উপত্যকা। ছোট ছোট জলাশয়ে, ছোট ছোট গ্রাম আর বনভূমিতে গৈরিকবর্ণ সমগ্র ধলভূম চিত্রপটের মতো আঁকা। মোটর এঁকে বেঁকে চলেছে। মাঝে সহসা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, যেন জানিয়ে গেল এখানকার শ্রাবণের বিষণ্ণ দিনগুলি কী গভীর অর্থে ভরা। তারপর এলো শরৎ, আলো-ছায়ার দোলায় আকাশ দুলিয়ে চলে গেল। স্নিগ্ধতর বাতাস লাগছে চোখে মুখে।

পৃথিবী সুন্দর, মানুষ হয়তো বা আরো অপরূপ, কিন্তু সহজ প্রসন্ন জীবন যারা যাপন করতে পারল না তাদের চেহারা আজ কেমন? রাষ্ট্রীয় নির্বুদ্ধিতা আর নির্বোধ নেতৃত্বের উৎপাতে বাংলাদেশ আজ জর্জর, কিন্তু তার মর্মের চিত্র আরও ভয়াবহ। স্বচ্ছন্দ আত্ম-প্রকাশের পথ না পেলে অগ্রসরবাদী বাঙ্গালী যৌবনের কী করুণ বিকৃতি ঘটতে পারে তার প্রমাণ ত দেখছি আধুনিক গদ্যকবিতায়। ওদের মধ্যে গদ্যও নেই, কবিতাও নেই, আছে শব্দবাহুল্যের ফেনায়িত নিষ্ফলতা। অর্থের প্রয়োজন নেই, অনর্থ কিছু একটা ঘটলেই ওরা খুশি। উচ্চশিক্ষা আর প্রতিভার মধ্যে যে অনেক প্রভেদ, ওদের বিদ্যার মধ্যে এই সত্য নেই; সেই কারণে শব্দ-পাণ্ডিত্যের আবরণে ওরা শক্তির দৈন্য ঢাকতে চায়। ওদের অপরাধ নেই, কারণ বাঙ্গালী

জীবনের মূলে রয়েছে বেকারের অসন্তোষ। কর্মহীন দরিদ্র বেকার যখন গদ্য কবিতা লেখে তাকে কাজ দিয়ে সৎপথে আনা সহজ ; কিন্তু সম্পদশালী ধনী বেকার অথবা বেকার পণ্ডিত যখন অর্থহীন শব্দের বুদ্‌বুদ্ ফোটায় তখনই সন্দেহের কারণ ঘটে। তারা পাঠক ভোলায় না, ভোলায় নিজেদের। নিখুঁৎ উন্মাদের অভিনয় করে বলেই অনেকে ওদের বাহবা দেয়, ওরা মনে করে ওই বুঝি প্রতিভার নগদ বিদায়। গদ্যকবিতা যে নিন্দনীয় তা বলিনে,—অর্থসঙ্গতি, ভাবব্যঞ্জনা আর রসাত্মক বাক্য যে আকারেই আসুক না কেন তাকেই কবিতা বলবো। কিন্তু অবচেতনার অসংলগ্ন প্রলাপে আধুনিক গদ্য কবিতা পাগলা-গারদের কথা স্মরণ করায়।

নির্জন পার্বত্যপথ, সেই পথের শাখা-প্রশাখা ছোটনাগপুরের নানাদিকে প্রসারিত হয়েছে। মাঝে মাঝে বনবীথিকার মধ্যে তাদেরই শিরা উপশিরার ন্যায় পায়ে চলা পথরেখা শাল-পলাশের বাঁকে বাঁকে হারিয়ে গেছে, প্রাণ যেন চলে তারই পিছনে নিরুদ্দেশ লক্ষ্য নিয়ে। দেখতে দেখতে দিনান্তকালের সূর্য অস্ত গেল, আমাদের মোটর আবার ঘুরে এলো পূর্বদিকে। ছোটনাগপুরের আকাশ আর উপত্যকা বর্ণের আড়ম্বরে বিচিত্র হয়ে উঠলো। তারই ক্ষীয়মান রশ্মিজাল সম্পূর্ণ

লুপ্ত হবার আগে শুক্লপক্ষের চন্দ্র এসে হাজিরা দিল। সমস্ত দিগন্তভরা অস্তগত সূর্যের আভার সঙ্গে মেলানো শুক্ল একাদশীর জ্যোৎস্না। আমাদের মোটর দ্রুতবেগে চলেছে। আমরা রামগড় থেকে ফিরে চলেছি রঁাচীর দিকে।

কথায় কথায় পুনরায় প্রগতি সাহিত্যের দিকে নেমে এসেছিলুম। ভাবীসাহিত্যে বাস্তববাদ কতখানি থাকবে, রোমান্টিক মেজাজকে সমাধিস্থ করা হবে কিনা, জীবনকে আরো রূঢ় আরো সত্য ক'রে প্রখর আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ব্যাখ্যায় আর বিশ্লেষণে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা প্রয়োজন,— মনে মনে এ তোলাপাড়াও ছিল। ভাবছিলুম জীবনের সর্বাঙ্গীন বিরাটত্বের যে রিয়লিটি তাকে প্রকাশ করাই বড়, না, ভাবীকালের জীবনকে যুক্তি ও বাস্তব-বাদের ভিত্তিতে নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রে নেওয়াই প্রগতি সাহিত্যের পরম লক্ষ্য ?

কিন্তু এর মীমাংসা হবার আগেই বন্ধুরা সহসা মোটর থামালেন। প্রায় কুড়ি মাইল এসেছি, শুক্ল একাদশীর জ্যোৎস্নায় সমগ্র ধলভূম পরিপ্লাবিত। মনে করেছিলুম দিকদিগন্ত নীরব, কিন্তু তা নয়, ঝিল্লির ঝনকঝঙ্কারে চারিদিক মুখর। চন্দ্রের দিকে চোখ তুলতে গিয়ে দৃষ্টি চ'লে গেল আরো উর্ধ্বে, আকাশের

হৃৎপিণ্ডের দিকে। সহসা মনে হোলো মহাকাল চলেছে তার দুরন্ত পাখার ঝাপটায় ঝড় তুলে যুগ থেকে যুগান্তরে, তার অন্ত নেই, তার অবধি নেই। নিত্য পরিবর্তন আর বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সেই কাল-ভৈরবের শাসন চলেছে দুর্দান্ত তাড়নায়। আমরা শিশুমানবক, আমরা তার পথের দিকে চেয়ে থাকি, আর বুকের মধ্যে শুনি পলকে পলকে তার পাখার ঝাপট।

নিশ্বাস ফেলে আবার মোটর ছুটলো। রাঁচী শহরে এসে পৌছলাম রাত আটটা।

প্রবাস-মিলন

শীতকালের উৎসবগুলো বড়দিনকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। বড়দিনকে বড় ক'রে দেখার হয়ত কারণ আছে,—সেটা খৃষ্টজন্মের কাল। কিন্তু গ্রীষ্ম-কালের প্রখর রৌদ্রের দিনে যদি যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করতেন, তবে এত উৎসব হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতো না। এর পক্ষে যুক্তি হোলো, শীতের দিনে কায়িক অধ্যবসায় থাকে প্রচুর, শরীরের রক্তে তেজ বাড়ে,—তখন এক উৎসব থেকে অন্য উৎসবে ডিঙিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে। সামাজিক পর্ব বলো, কংগ্রেস বলো, রাষ্ট্রিক আন্দোলন বলো, শীতের দিনেই জমে বেশী। পোষাকে, আহারে, বিহারে, নাচে-গানে, উৎসবে, তামাসায়—শীতটা ঘোরালো। এটা কমলালেবুর মাস, লেবুর রক্তাভা ফুটে ওঠে মেয়েদের গালে, ওর ঠাণ্ডা মধুর রসে ছেলেদের মনে আসে উদ্দীপনা। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ খুবই স্পষ্ট। শীতের হাওয়ায় গাছপালা শুকিয়ে ওঠে, ভিতর থেকে রস যায় মরে—আসে একটা দিগন্তব্যাপী জড়তা। আগামী বসন্তের তপস্যায় আধমরা শীত যেন পাংশুল আবরণে জড়িয়ে হি হি করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু

মানুষ এগিয়ে যায়, শীতের চাবুকে তার রক্তে আসে জোয়ার, জড়তার গর্ভ থেকে উঠে উজ্জ্বল রৌদ্রে সে দুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে দিক থেকে দিগন্তরে। রক্তে তার নেশা লাগে ভ্রমণের, জয়ের, দুরাশার ও শাসনের।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আলস্যটা মজ্জাগত। দ্বিপ্রাহরিক আহার আর তাকিয়ার গায়ে দিবানিদ্রায় আমাদের হাই ওঠে। আলস্য আর আরামপ্রিয়তাটা অপরাধ নয়। আমাদের দেশে কাজের চেয়ে যে কথা বেশী, তার গোড়াকার কারণই এই। এদেশ গ্রীষ্ম-প্রধান এবং গরমে যে কাজ করা অপেক্ষা গান গাওয়া সহজ, শাসনতন্ত্র রচনা করা অপেক্ষা বৈঠকী আলাপ জমানো বেশী প্রিয়—একথা কে না জানে। তাই হঠাৎ শীতের দিনে আমাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার মূলে যেন একটা কঠিন টান পড়ে। এই দু'মাস শীতের হাওয়ায় আলস্যের প্রতি আসে বিরক্তি, বাতের কনকনানির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করতে ভালো লাগে। বড়দিন ব'লে আমোদ নয়, খৃষ্টজন্মের কাল ব'লে উৎসবের আয়োজন নয়,—এ কেবল শীত বলে। পায়ে পায়ে পথে পথে নতুন কাজের উৎসাহ আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়, অনেকটা সেই কারণে। কমলালেবুর খোসায় ডিসেম্বরের আস্বাদ এসে পড়ে।

এমন মধুর শীতে যদি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন না হোতো ওর সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো উৎসাহ থাকতো না। শীতের দিনে ওর আসর বসে, তাই অনেকের আকর্ষণ, বিদেশে ওর আয়োজন হয়—তাই অনেককে বারে বারে টেনে নিয়ে যায় বাঙ্গলা থেকে বৃহত্তর বঙ্গে। সাহিত্য-প্রীতির জন্য যারা যায় সাহিত্য সম্মেলনে, তারা নির্ভুল কথা বলে না। কারণ সাহিত্য সম্মেলনে যদি বা গোটা দুই চার ভারি ভারি প্রবন্ধ থাকে সেগুলি 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' হয়ে থাকে—কিন্তু সাহিত্য সেখানে থাকে না। সাহিত্য ঘরের কোনে, মলিন মৃৎপ্রদীপের নীচে উপবাসী মন যদি ভাবনায় বেদনায় দুরাশায় উধাও হয়ে যায়, সেখানে হয়ত দেবী ভারতীর কটাক্ষপাত হ'তে পারে। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন না ব'লে প্রবাসী বাঙ্গালীর মেলা বললে ভুল হোতোনা। এই মেলায় এসে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা নতুন মানুষ, বাঙ্গলায় তাঁদের দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন যেটা বসে, তার চেহারায় যেন নতুন সমাজের হাওয়া, নতুন দেশের সংবাদ। দেখতে দেখতে মন খুশি হয়ে ওঠে। দূরের মানুষ যদি আমাদের ঘরে এসে দাঁড়ায়, তাদের কাছে যেমন চট করে ঘরকন্নার অভাব অভিযোগের কথা আমরা বলিনে, বলতে মুখ

ফোটেনা,—তেমনি প্রবাসী বাঙ্গালীর মেলায় বাঙ্গলা দেশের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করতে মনও ওঠেনা। তাঁদের প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, থাক—অন্য কথা হোক, তাঁদের জড়ো করে বিদেশের গল্প শুনি। আনন্দ আর নির্ভাবনার পথ ধ'রে নিজেকে ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সাহিত্যের কথা, গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলাপ—এসব সেখানে শুনতে যদি কেউ না চায় তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সাহিত্যের ভালোমন্দ, বিজ্ঞানের প্রগতি, দর্শনের উন্নতি —এদের জন্যে বই কাগজ আছে, সাময়িক পত্রের বাজার আছে, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর মেলা এদের জন্যে নয়, এখানে যেন একজন অপরিচিত বাঙ্গালী আর একজন অপরিচিতকে আবিষ্কার করতে যায়, তাকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ করে, আলাপ করে, সাদর অভ্যর্থনায় অস্থায়ী বাসার মধ্যে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করে।

বেশ মনে পড়ছে আগ্রা অধিবেশনের কথা। পৌষের প্রভাতে গিয়ে নামলুম সেণ্ট জন কলেজের প্রাঙ্গণে। তখনও রোদ ওঠেনি। শীতে আড়ষ্ট হয়ে হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে স্কুল বাড়ীর একটা ঘরে গিয়ে উঠলুম। একজন যুবক বললেন, হ্যাঁ, এই ঘরটাই ক্যাল্‌কাটা। দশ বছর আগেকার সেই বিস্ময়

আজো মনে পড়ে। ঘরটার নাম কলিকাতা! কলিকাতা বন্দী হয়েছে একটা ঘরে। পাশের ঘরের দেয়ালে আর একটা নাম লেখা, মীরাট! আর এক-টায়, দিল্লী। তারপর আরম্ভ হোলো, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কানপুর—এমনি ঘরের পর ঘর। একই বাড়ীর মধ্যে অসংখ্য শহর আবিষ্কার! সেই বিস্ময় আমার মনে এনেছিল এক একটি নতুন ছবি। বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর আশা আর কল্পনা, বাঙ্গালীর আত্মবিস্তার—যেন সমগ্র ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; প্রত্যেক অধিবেশনে যেন সেই মহিমার সংহত চিত্রা-বলী। ছোট একখানা ঘর, কিন্তু তার মধ্যে হয়ত পেলুম সুদূর রাজপুতানার আভাস। সেই হরিণ ছুটে চলে বালুময় প্রান্তর পেরিয়ে মরুভূমির অজানায়, সেই ময়ূরের পালকপরা রঙীন ঘাঘরা ওড়ানো নাগরিকার ঘুঙুরের গান। যিনি আলাপ করলেন তিনি হয়ত মেয়ে, হয়ত বা পুরুষ—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। চোখ চেয়ে দেখলুম, তাঁর চেহারায় দিগন্তহীন মরুভূমি আর রাজপুতনার রহস্য। যশলমীরের দুর্গ আর ধাত্রী পান্নার কাহিনী, সেই রাণা প্রতাপের দুর্দমনীয় বীরত্বের ইতিহাস। সেখান থেকে ফিরে এঘরে এসে দাঁড়ালুম।

—আরে আসুন আসুন, নমস্কার—এবারে

এসেছেন তা হ'লে? কই, আপনি যে বলেছিলেন, লাহোর যাবেন? এলেন না ত?

হেসে বললুম, এঘরটা বুঝি লাহোর?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়ি ঠাণ্ডা। লাহোরে জল যাচ্ছে জমে।

মনে পড়ে গেল লাহোরের গুলবাগ আর চিড়িয়াখানার ছায়া-ঝিলিমিলি পথ। বাদশাহী মসজিদের পাশ দিয়ে ছোট রাস্তা গেছে কোন্ পল্লী থেকে কোন্ পল্লীতে। শহর কেতোয়ালী পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কোন্ পথ গেল কোন্ দিকে; সেই অসমাপ্ত ভ্রমণ আর শেষ হোলো না। সামান্য লাহোর, কিন্তু আজ এই সেণ্ট জন কলেজের কক্ষে বসে সেই অসামান্য লাহোরের রহস্যময় পথঘাটের আর কূল কিনারা পাইনে।

আরে, এই যে, এসেছেন আপনি? আ, ভুলে গেছেন বুঝি আমাকে? ঠিক মনে করে দেখুন ত, কোথায় আমার সঙ্গে আলাপ?

হেসে বললুম, ঠিক মনে পড়ছে না।

তিনি বললেন, আমি শচীন সরকার।

চিনতে না পেরে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। ভদ্রলোক পাশে এসে বসে ব'সে বললেন, সেই যে, জয়পুরে? মাজি ধর্মশালার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ

—প্রায় বছর চারেক হোলো। আমি চললুম সগোরের দিকে, আর আপনি গেলেন বম্বে,—মনে পড়ছে ?

হেসে বললুম, হ্যাঁ, ভালো আছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর, বাঙ্গলাদেশের খবর কি বলুন।

বললুম, আপনি এখন কোথায় ?

এই ত কাছে, অমৃতশহরে। চলুন না, এক রাতের পথ।—আরে দাদামশাই যে,—কই দিদিমাকে আনেন নি ? দিল্লীতে শীত কেমন ?

আরে ভায়া,—ব'লে স্থূলকায় দাদামশায় এলেন এগিয়ে। বললেন, শীতের মালুম ত হচ্ছে আগ্রায়। ভালো আছো ত ?

এমনি ক'রেই আলাপ চলে। একই ঘরে বিভিন্ন দেশ এসে জড়ো হয়। বোম্বাই থেকে এলাহাবাদ, নাগপুর থেকে গোরক্ষপুর, পাটনা থেকে কানপুর। একজন আগন্তুককে দেখছি, তার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে অজানা কোন্ দেশের অজ্ঞাত ইতিহাস।

রাঁচির কথা ভাবছি। কত যাত্রী কত দেশ থেকে এলো দলে দলে। কত কণ্ঠে কত কাহিনী। বিবিধ পথের গল্প জমলো হুড্রু প্রপাতের নীচে পাথরের পেটিতে বসে। অধিবেশন একটা আছে বৈ কি, সেখানে

আধুনিক সাহিত্যের তিল তর্পণ ও শ্রাদ্ধ হয়। তা' হোক, তার চেয়ে এই ভালো। এই অজানা সাঁওতালী পাহাড়ের নীচেকার নির্জন প্রপাতের ঝরো ঝরো শব্দে মন ছুটে চলে এই সব যাত্রীর সঙ্গে। এরা আজ একই গাছে বাসা বাঁধলো, কিন্তু ঠিক সময় বাসা ভেঙে উড়ে যাবে আপন আপন আকাশপথে। কে শুনছে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা, কে জানতে চাইছে আধুনিক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কে ভাবতে বসেছে জড়বাদী বিজ্ঞানের গতি আর প্রগতি? মুখে চোখে দেখি স্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গে বলিষ্ঠ উৎসাহের ভাব, পোষাকে পরিপাট্য, আলাপে আর আচরণে স্বভাব সরলতা। বেশ লাগছে এখানে বাঙ্গলাকে ভুলে থাকতে। ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে তাঁদের যারা একদিন এই মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

শীতের দিনের উৎসব, কমলালেবুর মাস, তাই এই সাহিত্য সম্মেলন এত প্রিয় হ'তে পেরেছে। খররৌদ্র জ্যৈষ্ঠের দিনে প্রবাসী বাঙ্গালীকে ডাক দিলে কেউ আসতো না; শ্রাবণের দুর্যোগে ডাক দিলে সাড়া মিলতো না; পুজার সময় মেলা বসালে কেউ ফিরেও তাকাতো না। শীতের রৌদ্রে আসে মনের সক্রিয়তা; কমলালেবুর মধুর রসে পাওয়া যায় ছুটির আনন্দ। তখন সাহিত্য সম্মেলন হোক আর রাষ্ট্রিয় আন্দোলন

হোক—সকলের মাঝখানে গিয়ে ভিড় জমাতে ভালোই লাগে। সাহিত্যকে তখন যদি কেউ লাঞ্ছনা করে, তবে তার নিবু´দ্ধিতাতেও আনন্দ পাওয়া যায়, নব্য সম্প্রদায়ের শিক্ষা আর সভ্যতাকে যদি কেউ চাবকায়, তাকে নিয়ে আমোদ করতেও ভালো লাগে। আসল কথা, উৎসবটাই বড়, মেলামেশাটাই মধুর, খাওয়া দাওয়াটাই উৎসাহজনক এবং ভ্রমণ ক'রে বেড়ানোটাই আনন্দদায়ক। দিল্লী, মীরাট, ইন্দোর, পাটনা, রাঁচি —সব দেশেই এই একই কথা, একই চেহারা। এক একটা অধিবেশন, এক একটা ভ্রমণের তালিকা। একজন দীর্ঘকাল ধ'রে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন,— এক সময় তিনি থামলেন। যেন সবাই বাঁচলুম। অমনি প্রেক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে ভ্রমণের দিকে পা চালিয়ে দেওয়া গেল। সব তামাসার মধ্যে প্রবন্ধ-পাঠও যেন একটা তামাসা। বক্তা আর শ্রোতার সঙ্গে যোগ হোলো কৌতুকের। সভাপতিরা গভীর অনুরাগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা চালাচ্ছেন, আমরা কয় বন্ধু মিলে চুপি চুপি তাঁর পোষাক আসাক আর মুদ্রা-দোষ নিয়ে হাসাহাসি করছি। তাঁর কথায় কান দেবার দরকার নেই, তাঁর দিকে চোখ মেলেই আমরা খুশি। একজন মহিলা উঠলেন কবিতা পাঠ করতে, আমরা হাসলুম তাঁর অঙ্গসজ্জা আর প্রসাধন পারিপাট্য

দেখে। যাঁর গায়ে অমন শালের জামা, অমন জরীর শাড়ী, অমন কানের ঝুম্‌কো, আর কণ্ঠস্বর যাঁর অমন মিষ্ট, তিনি ত' ভালো কবিতা লিখবেনই। তিনি মস্ত কবি-প্রতিভা না হয়ে যাবেন কোথায়? অমনি কানে কানে একজন বললেন, মহিলা কবি নয় হে, উনি কবি-মহিলা।

একজন ভদ্রলোক উঠলেন। তিনি একেবারে জাব্বা জোব্বা। তাঁর প্রবন্ধ অতিশয় ভালো। এ প্রবন্ধ না লিখলে পৃথিবী অবশ্যই রসাতলে যেতো— সভাপতি বললেন। কী ভাষা, কী ভাব! প্রবন্ধটি বড়ই দীর্ঘ, তাঁর পরমায়ু অপেক্ষাও দীর্ঘ। পাশ থেকে চিম্‌টি কেটে অমনি মুখুজ্যে সাহেব বললেন, 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!' প্রবন্ধ শেষ হতেই চারিদিক থেকে, বাহবা! বিষয়বস্তুর জন্যে বোধ হয় নয়, প্রচেষ্টার জন্যে। কিন্তু আর নয়। একজন নেপথ্যে বললেন, টিফিনের সময় হোলো যে!

হল ঘরের মধ্যে শাসন, বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা। সাহিত্যের অধিবেশন নয়, রসালাপের বৈঠক। বৈঠকে আমরা যোগ দিই উপদেশ শুনতে নয়, গান-গল্প আর হাসি-তামাসার জন্যে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে এর প্রচুর উপকরণ মেলে।

এরপর একদিন সব ভেঙ্গে যায়। হাটের পসারীরা যে যার চলে যায় প্রবাস জীবনের নিয়ম-তন্ত্রের বাঁধা পথে। আবার কোথায় দেখা হবে? কেউ বলে মান্দ্রাজ, কেউ বলে আসাম, কেউ বা বলে মধ্যদেশে। কোথায়, ঠিক নেই, কিন্তু আসছে বছরে ঠিক দেখা হবে।

নমস্কার।

মনে-মনে

'Gallantry'—এই শব্দটা বাল্যকালে ছায়ার মতন আমার পিছনে পিছনে ঘুরতো। দুর্বল, কৃশকায় বালক, চারিদিকে ভয়ভীরু অনুসন্ধিৎসু চক্ষু—আমার সরল অর্বাচীনতা ছিল খুবই হাস্যকর। নিশুতি রাত্রে অভিধান খুলে দেখতুম gallantryর প্রতিশব্দ কি। এই শব্দটাকে লালন করতুম মনে মনে।

বাড়ীতে ছিল রক্ষণশীলতা আর শাসন, আধুনিক শিক্ষার আলো তখনো বাড়ীতে জ্বলেনি। কিন্তু আমার একটা বিস্ময়কর অভ্যাস ছিল, একটা নিগূঢ় নির্বোধ অন্ধ প্রকৃতির প্রভাবে আমি কেটে ফেলতুম আমার বাধা। অনেক মার খেয়েছি, পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, হাত-পা-কপাল-মাথা কেটে প্রচুর রক্ত ঝরেছে বারে বারে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে দিনের পর দিন। কিন্তু তবু তেপান্তর পার হওয়া রাজপুত্র দুঃসাহসিক বিক্রমে শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করেছে অন্ধকার অরণ্য উত্তীর্ণ হয়ে। ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে বর্শার ফলকে দুরন্ত ব্যাঘ্রকে গাছের সঙ্গে বিদ্ধ ক'রে রেখে ধূলো উড়িয়ে চ'লে গেছে। ভাবতুম gallantryর কথা।

কোথাও জয়লাভ করতে পারিনি, পদে পদে আমি

পরাজিত। হয়ত জয়ের আশা কোথাও নেই তাই নিস্ফল যুদ্ধের পিপাসা আমার রক্তগত। হেদুয়ার বাগানে একটি সন্ধ্যা স্বপ্নের মতন মনে পড়ে। আমার বন্ধু অনন্ত-র সঙ্গে আরেকটি বন্ধুর ঝগড়া বাধলো। দুর্বলের পক্ষ নিলুম বটে, কিন্তু অনন্ত-র হাতে ছিল পেন্সিল কাটা ছুরি,—আমাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে আমার পায়ের ডিমে সেই খৃষ্টান বালক ছুরিখানা বসিয়ে দিলে। অস্পষ্ট গ্যাসের আলোয় সুন্দর তরুণ হিংস্রতা অনন্ত-র চোখে তখন ধক ধক করছে, একটি মুহূর্তের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অপরূপ সেই হিংসার ছবি। আমি কাঁদিনি, কারণ নিজের পায়ের উপরে সেদিন উত্তপ্ত রক্তের ধারা অন্ধকারে গড়াতে দেখলুম—এক নিবিড় রুদ্ধ আনন্দ আমার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে দোলাতে লাগলো।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধলো। দুরন্ত উল্লাস যেন পদ্মার মতন ভাঙন ধরালে আমার প্রাণের তটে তটে। মৃত্যুর বিভীষিকা আর ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মরণোন্মুখের আর্তরব আমাকে যেন আর স্থির থাকতে দেয় না। স্কুল পালিয়ে খেলাধূলো বন্ধ ক'রে বন্ধুদের এড়িয়ে ডাফ-চার্চের ধারে গিয়ে একান্তে বসতুম—ওখানে কে যেন একজন 'বসুমতী' পড়তো। লর্ড কিচেনার জাহাজ সুদ্ধ ডুবে গেলেন, বাড়ীর ছাদের এক প্রান্তে ব'সে আমি

কেঁদে আকুল। সেই চক্ষু সাগর নীলিমায় ভরা, অদ্ভুত ওই নাবিকের পোষাক, সমগ্র বিশ্বের দিকে ওই রহস্যময় প্রলয়-কটাক্ষ,—সমস্তটা অতল তলে তলিয়ে গেল। আমিও ডুব দিলাম সেই উত্তর স্কটল্যাণ্ডের হিমাচ্ছন্ন সাগরের গর্ভে কিচেনারের পাতাল প্রবেশ-পথের চিহ্ন অনুসরণ ক'রে।

বাঙ্গালী পল্টন যাবে যুদ্ধে। আমাদের পাড়া থেকে জন তিনেক। আমার রক্তপাগল বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাড়ীর আগল ভেঙে অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি পালাবো, কেউ জানবে না। জাহাজে গিয়ে উঠবো শিকল বেয়ে, যাবো অজানায়, যাবো দুর্গম রণক্ষেত্রে। কামানের মুখে গোলা পুরে দেবো, ঘোড়ায় চড়ে ছুটবো তরবারি হাতে নিয়ে, মানুষের রক্তে রাইন্ নদীর জল দেবো রাঙা ক'রে। কিন্তু হায়, এস-কে-মল্লিক আমাকে চিনতে পারলো না—আমার হৃদয়ের কুরুক্ষেত্র কত বিশাল, কত বীরত্বময়,—তিনি আমাকে বারম্বার প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি কত অনুনয়-বিনয় করলুম, কত বক্তৃতা দিলুম, তিনি বিডন স্ট্রীটের আপিসে ব'সে হেসে আমার পিঠ চাপড়ে শুধু বললেন, যদি আরো বছর দশেক যুদ্ধ চলে তখন তুমি এসো শেষের দিকে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে চলেছে শত শত বাঙ্গালী

পল্টন—রাইট্-লেফট্, রাইট্-লেফট্—আর আমি সেই সহস্র সহস্র দর্শকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসালুম। প্রিয়-বিচ্ছেদের কী বেদনা! আমার বুকের উপর দিয়ে লোহাবাঁধানো বুট-পায়ে সেই একান্ত আত্মীয়ের দল আমার চির জীবনের শান্তি নষ্ট করে বৃহৎ জীবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের অনেকের অস্থি-র চিহ্ন কি আজও খুঁজে পাওয়া যায় মেসোপোটেমিয়ার কোনো দুর্গম ঊষর পাহাড়ের ধারে, কিম্বা আরব মরুভূমিতে, তুরস্কের শ্মশানে কিম্বা ফ্রান্সের নির্জন প্রান্তরে? আজও তাদের কথা স্তব্ধ হয়ে ভাবি। তাদের রক্তে আমার জীবন লাল হয়েছে।

আমার শিরার শোনিতে রয়ে গেল সেই ঘোড়া ছোটাবার নেশা। ফ্রান্সের যুদ্ধে যাইনি কিন্তু সংগ্রাম সুরু হোলো তরুণ যৌবনে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলুম বিপুল আয়োজনে। কোটি কোটি মানুষের শোভাযাত্রা চলেছে পৃথিবীর পথ দিয়ে, কিন্তু নিরুদ্দেশ নিঃসঙ্গ জীবনে আমার বেড়ে চললো রণ-পিপাসা! আমার সমস্ত শৈশব কৈশোর আর যৌবন কেবল যুদ্ধ ও হিংসার একটা দীর্ঘ ইতিহাস।

পরাজিত উৎপীড়িত আমি কল্পনায় চিরদিন ছুটিয়ে বেড়াই আমার উন্মত্ত ঘোড়া উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ

মেরু। ওই gallantry শব্দটার অর্থ খুঁজি দুর্গম অরণ্যে, দুরারোহ তুষারাচ্ছন্ন পর্বতে, অজানা নদীপথের পারে পারান্তরে। হাতের তরবারির ঝলক জ্বলে ওঠে ভাগ্যের বিরুদ্ধে, জীবন-জোড়া অসন্তোষের বিরুদ্ধে। যুদ্ধই জীবন—এই শিক্ষাটাই আমার সকলের বড়।

তিরিশ পেরিয়ে গেল। বাঙ্গালীর জীবন কতটুকু? হাতে অস্ত্র নেই, তাই কলম ধরেছি। তবু কালির দোয়াতে কলম ডোবাতে গিয়ে আজও একটি আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে, মনে হয় তরবারির প্রান্তটা রক্তে ডুবিয়ে যেন শাদা কাগজের ওপর আঁচড় টানতে যাচ্ছি। এটা ভুল, এটা নিরুদ্ধ মনোক্ষোভের বিভ্রান্তি।

Gallantry শব্দটার অর্থ আজো অভিধানে খুঁজে পাইনি, কিন্তু জওহরলালের কথাটা মনে পড়ে—'the wide world still beckons to those who have courage and thought.'

১৯৩৯ সালে আবার যুদ্ধ বাধলো। কিন্তু তরবারিতে মরচে ধরেছে, সেই দুরন্ত রণতুরঙ্গ জরাশীর্ণ, নিজের পা দুখানাও বিশ্রামের জন্য লালায়িত। বিক্রমের বদলে এসেছে বিবেচনা, যৌবনের উন্মাদনাকে শান্ত করেছে যুক্তিবাদ। কিন্তু আমার প্রাচীন রক্তধারা? যদি রণদামামায় আবার বাঙ্গালীর ঘরের ভিত কাঁপে,

যদি অফিসার কমাণ্ডিঙের বিউগল্ বাজে, যদি গণ-তন্ত্রের মহিমান্বিত আদর্শের পথে ওরা চলে দলে দলে —রাইট্-লেফট্, রাইট্-লেফট্, কুইক মার্চ—স্ট্যাণ্ড্ য়্যাট্ ইজ্—তবে কি কলম হাতে নিয়ে স্থির হয়ে ব'সে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে?

এখনো সেই প্রেতের ছায়া অন্ধকার রাত্রে প্রায়ই চুপি চুপি আমার পিছন ধরে,—সেই gallantry!

পথের বাসা

আমাদের শাস্ত্রের কথা, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু অল্প মানে কী। কা'কে বলব বেশি, আর কাকেই বা বলি অল্প। যিনি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি তিনিও বলতে পারেন আরো বেশি চাই, আর যিনি পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরানি তিনি একশো টাকা পেলে মনে করেন তিনি অনেক পেয়েছেন। সুতরাং দেখা গেল, কম আর বেশির কোন স্পষ্ট নিরীখ নেই। কিন্তু এই কথাটা শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, নাল্পে সুখমস্তি।

অল্পে সুখ নেই, তার মানে—যা আছে তাই সব নয়, আরো চাই। যতই পাই তৃপ্তি নেই, যতই সৃষ্টি করি পূর্ণতা নেই, যতই আবিষ্কার করি আনন্দ নেই। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনে এই বেদনাবোধ, অল্পে সুখ নেই। আগে মানুষ পরতো গাছের ছাল আর থাকতো গুহায় গর্তে। তারপর সন্তানদের প্রতি স্নেহে মমতায় তাদের মনে সভ্যতা সৃষ্টির ব্যাকুলতা জন্মালো, তারা ঘর বানালে। গাছের বাকল ছেড়ে কাপড় পরলে, সমাজ তৈরি করলে। আজ এই সভ্যতার শেষ যুগে এসে দাঁড়িয়ে তারা একে একে কী না

আবিষ্কার করেছে ? শূন্যে ওড়ালে জাহাজ, জলের নিচে গিয়ে জাহাজে লুকিয়ে রইলো, বিদ্যুতের তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলে মুখের ভাষা রেডিয়োয়, সহস্র যোজন দূরের ছবি দেখিয়ে বললে, টেলিভিশন্। কিন্তু তবু থামলো না, মানুষের ক্ষুধার অভিযান চলেছে যুগ থেকে যুগে। অবিশ্রান্ত মৃত্যুকে তারা জয় করবে, ঈশ্বরকে আবিষ্কার করবে, জ্যোতিষ্ক লোকে পাড়ি জমাবে। অল্পে সুখ নেই। অসীম অধ্যবসায় সহকারে যা পায়, তাকে অবহেলায় পরিত্যাগ ক'রে মানুষ আবার ছোটে সেইদিকে যা এখনও পাওয়া যায়নি। সাহিত্য বলো, শিল্পকলা বলো, কীর্তি বলো—এর মধ্যেও সেই কথা, মনের যে কামনা, যে ক্ষুধা আর স্বপ্ন তাকেই প্রকাশ করা, তার জন্যই ব্যাকুলতা জাগানো।

এর কারণ কি ? এর কারণ হোলো মানুষের স্বভাবের মধ্যে বৈচিত্র্য আর নূতনত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। ঘর ভালো না লাগলে আমরা পথে বেরিয়ে পড়ি, পথ ভালো না লাগলে ঘরে এসে ঢুকি। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে, নিত্য নতুন ঘরে বাসা না নিলে তাদের মন খুশি হয় না। অনেক ঈশ্বর-সন্ধানী সন্ন্যাসী আছে যারা কোথাও স্থির হয়ে আসন পাতে না। তাদের প্রাণের মধ্যে চিরকালের অসন্তোষ এক ঠাঁই থেকে আর এক ঠাঁইয়ে ছুটিয়ে

নিয়ে বেড়ায়। আর এক জাতের মানুষ আছে তারা বোহেমিয়ান্, ভবঘুরে, আত্ম-তাড়নায় কেবলই ছোটে। কোথাও তাদের বাঁধা অন্ন নেই, কোনো খোপেই তারা খাপ-খায় না। কেবল খুঁজে বেড়ায় ঘর, আর মনে মনে বলে, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

এমনি বিচিত্রের সন্ধানে ছুটতে গিয়ে মানুষ পথে পথে বাসা বাঁধে। ঘরের মধ্যে আরাম ছিল, আনন্দ ছিল—পথে তা নেই, পথে আছে দুঃখ দুর্যোগ, ঝড়-ঝাপ্টা, রোদ-বৃষ্টি। তবু সেই পথ ভালো লাগলো, সেখানে বৈচিত্র্যের আস্বাদ আছে, কঠোর ক্লেশের মধ্যে আছে শিকল ছিঁড়ে পালানোর স্বস্তি। সেই জন্য আমরা যখন কাজ থেকে ছুটি পাই তখনই বেরিয়ে পড়ি অজানার দিকে। যে জগতটুকু আমরা প্রতিদিন ধ'রে জানি, যার চেহারায় আর কোথাও নতুনত্ব নেই তাকে পিছনে ফেলে পালাই। যেদিকে যাবো সেদিকের কিছু জানিনে, তবু সেই অপরিচয়ের দিকে যাবার জন্য একটা অদম্য বাসনা মাথা কুটতে থাকে। এই যেমন, পূজোর ছুটিতে আমরা যেখানে হোক পাড়ি জমাই। কেউ যায় পর্বতে, কেউ অরণ্যে, কেউ সাগরে, আবার কেউ বা দিগ্বিদিকে, কিন্তু ঘরে আমাদের মন স্থির থাকতে চায় না।

মনে-মনে

ছুটি মানেই মুক্তি। মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে ছাদে গিয়ে বসে, সেটা তাদের মুক্তি; ছেলেরা পাঠশালা থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে দৌড়য়, সেটা তাদের ছুটি। ছুটির ওপর আমাদের বড় লোভ, কারণ ছুটির মধ্যেই আমরা নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারি, পৃথিবীর সঠিক চেহারা চিনতে পারি। সেইজন্য ছুটির দিনে যখন আমরা দেশবিদেশে ভ্রমণে বেরোই তখন তার নাম দেওয়া হয় চেঞ্জ, অর্থাৎ পরিবর্তন। যে পোষাকটা কাজের দিনে আমরা পরে থাকি, চেঞ্জে যাবার সময় মন থেকে সেটাকে ঝেড়ে ফেলি। নতুন সজ্জায়, নতুন পৃথিবীতে পালিয়ে যাই। গ্রীষ্মের ছুটিতে গেলুম পাহাড়ে, সেখানকার আবেশ স্নিগ্ধ, বাতাস লঘু নির্মল, আমাদের প্রাণশক্তি হোলো সজীব। হয়ত সেখানে কোনো নির্জন পাইন কিম্বা ঝাউয়ের বনে একান্তে গিয়ে বাসা বাঁধলুম। কত বিচিত্র পাখীর কুজন গুঞ্জন, কত কীট পতঙ্গের নির্ভয় আনাগোনা, পাহাড়ে পাহাড়ে, ঝর্ণার ধারায় ধারায়, ইউক্যালিপটসের ছায়ায় ছায়ায়, লতাপুষ্পের গায়ে গা বুলিয়ে আমরা গান গেয়ে বেড়ালুম। মনে পড়ছে পাঞ্জাবের পাহাড়ী শহর শিমলায় আমাদের এক ভ্রমণের কথা। আমরা কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী মিলে গিয়েছিলাম প্রসপেক্ট পাহাড়ে বনভোজনে। পাহাড়ের

শীর্ষটি ছায়া ঢাকা তপোবনের মতো, সেখানে আমাদের তাঁবু পড়লো। আমাদের প্রধান কাজ ছিল রান্না শেখা! এটাই বন-ভোজনের বৈচিত্র্য। কোন্ সব্জীর সঙ্গে কোন্ সব্জীটা মানানসই হয় তারই একটা হিসাব নেওয়া। সারাদিন এই রান্নার পরীক্ষা করাতেই ছিল আমাদের কৌতুক। ঘরে বসে আমরা যা খাই, পথে নেমেই সেই চর্বিত চর্বণে আমাদের রুচি চ'লে যায়। মন যেমন নতুন স্বাদ পায়, জিহ্বাও তেমনি চায় নতুন আহার। পথে নামলে আমাদের সকল অভ্যাস যায় বদলে। এতে অসুবিধা হয়ত আছে, দুরবস্থাও হয়ত কিছু ঘটে, কিন্তু এতে আছে নতুন আনন্দের খোরাক।

বড় বড় ছুটির সময়ে ছেলেরা শিক্ষকের সঙ্গে যায় এক্স্কারশনে। এই ভ্রমণ কেবলমাত্র চেঞ্জ নয়, এর পিছনে শিক্ষার কথাটা থাকে। বাইরে যেমন ছুটোছুটির আনন্দ, মন তার পাশে থেকে তেমনি নিজের শিক্ষা নিজেই আহরণ ক'রে চলে। ধরো, পুরীর সমুদ্রের ধারে গিয়ে তাদের তাঁবু পড়লো। তারা শুনলো সমুদ্রের গর্জন আর বায়ুর স্বনন, দুরন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মাতামাতি করলো, কিন্তু একথা জেনে এলো যে—বাতাসে থাকে ওজন্, তা'তে নিশ্বাসের কাজ ভালো চলে, রৌদ্র ওঠা-নামার সঙ্গে সাগরের রং

বদলায়, সমুদ্র-লতা কা'কে বলে, উড্ডীন মাছ কেমন, লোনাজলের স্বাদ কিরূপ। জেনে এলো সীমাহীন সাগরের মহিমাময় দৃশ্য কেমন। এইগুলি হোলো শিক্ষা। ছবিতে ভাষা নেই, আছে নিশ্চল খণ্ড রূপ, তাতে প্রাণ অদৃশ্য। ছবি দেখেই যদি আমরা খুশি থাকতে পারতুম তাহলে পৃথিবীতে ভ্রমণের অর্থ থাকতো না, ঘরে বসেই আমরা দিল্লী আগ্রা দুর্গের ছবি দেখে কাজ চালাতে পারতুম। কিন্তু তা হোলো না, তাঁবু পিঠে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি দেশ দেশান্তরে, অজানা থেকে নিরুদ্দেশে। ছবির মধ্যে দৃশ্যমানতা আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; পটভূমি আর পরিবেশ নেই। আগ্রার তাজমহল যমুনার তীরেও যেমন নিশ্চল, ছবিতেও তেমনি স্থাণু—কিন্তু আমরা কাছে গিয়ে তাদের সজীবতা আবিষ্কার করি। কারণ তার চতুর্দিকে রয়েছে প্রাণময় আকাশ আর বাতাস, প্রাণময়ী যমুনা আর শরৎরাত্রির জ্যোৎস্না—সেখানে উদ্যান বীথিকার নির্জনে আমরা অশরীরি ছায়াচারীদের নিঃশব্দ নৈকট্য অনুভব করি।

পিঠে তাঁবু বেঁধে আমরা যাই অরণ্যে। ছবিতে আমরা দেখেছি গাছপালা, বন-জঙ্গল, কিন্তু অরণ্যের আবহের মধ্যে গিয়ে পাই অখণ্ড প্রাণস্পন্দন। লতায় পাতায়, শিকড়ে কোটরে, পতঙ্গে আর জানোয়ারে

অদ্ভুত চক্রান্ত। সেখানে মানুষ নেই, কিন্তু কোটি কোটি জীবনের চলাফেরা। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, জ্যোতিষ্কলোকের আশ্চর্য পরিবর্তন। যদি পথ হারাতুম সেই গভীর অরণ্যে তবে তারকার সঙ্কেত হিসাব ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারতুম।

এমনি করে আমরা তাঁবু নিয়ে বেড়াই পথে পথে। বাইরের দিকটায় সংগ্রহ করি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর ভিতরের দিকে জমে ওঠে গভীরতর শিক্ষা। মেরুপথে, তুষারের দেশে গিয়ে মানুষ বরফের ওপরে বাসা বাঁধে। ঝড়ে ঠাণ্ডায় দুর্যোগে কত মানুষ সেখানে বরফের তলায় সমাধিস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কি থেমেছে? বরফ ঠেলে ঠেলে মৃত্যুকে পদে পদে জয় ক'রে তারা পথ আবিষ্কার করেছে,সেই তাঁবুর ভিতরে ব'সে তারা পৃথিবীতে নতুন কীর্তি রচনা করেছে, মানুষের বুকের দুর্জয়কে জয় করার সাহস এনেছে। আমরা হিমালয়ে গৌরীশৃঙ্গ আক্রমণের খবর পড়ে থাকি, নন্দাদেবী আর নাঙ্গা পর্বত অভিযানের কাহিনী জানি, সেখানেও সেই পর্বতের পাদমূলে বেস্-ক্যাম্প, সেই তাঁবু খাটিয়ে মানুষের কীর্তির কাহিনী। অজানা দেশে তাঁবুবাহী মানুষের চোখে কত অদ্ভুত বস্তু এসে হাজির হোলো, কত নামহীন জীবজন্তুর প্রাচীন অস্থি খুঁজে পাওয়া

গেল, কত ধূল্যবলুণ্ঠিত ধ্বংশাবশেষ প্রাক্ঐতিহাসিক কালের সংবাদ এনে দিল।

মধ্য এশিয়ার প্রাচীন বাণিজ্য পথের কথা আমরা জানি। মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি সেই মরুভূমির পথে যুগ যুগান্তকাল অবধি মানুষ দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়েছে। সেখানে পদে পদে মানুষ পথ হারায়, জলের তৃষ্ণায় বালুর ঝড়ের মধ্যে রৌদ্রের জ্বালায় পোকার মতো তারা জ্ব'লে পুড়ে মরে, কিন্তু তবু তাঁবু ফেল্‌তে ছাড়েনি। কেন মানুষের প্রাণে এই প্রচণ্ড ক্ষুধা? কেন তারা তাঁবু পিঠে নিয়ে দুর্গম পার হয়ে চলে? ভারত সীমান্তে দেখে এসেছি তাঁবু ফেলেছে সৈন্য সামন্তের দল। দেশ-রক্ষা কেমন কৌশলে করতে হবে এই শিক্ষা তাদের হওয়া চাই। শত্রুপক্ষের চক্রান্ত, গোপন সংবাদ-চলাচলের চক্রভেদ, বিদেশী গোয়েন্দার বে-আইনী আনাগোনা, আকস্মিক বিপদকে আয়ত্ব করা, সমর-অভিযানের পথকে সুরক্ষিত রাখা, গুহা গহ্বর ও শত্রু কেন্দ্রকে কৌশলে অকর্মণ্য ক'রে দেওয়া—এই হোলো সেখানে তাঁবু ফেলে রাখার প্রয়োজন। সেখানে স্থায়ী ঘর বাঁধলে চলবে না, স্থায়ী সেখানে কিছুই নয়, কারণ যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে অন্যত্র

তাদের ডাক পড়তে পারে। তখন তাঁবুর বাঁধন উপ্‌ড়ে ফেলে তাদের নতুন অভিযান করতে হবে।

বিহারে পুন্‌পুন্‌ নদীর ধারে আমরা একবার তাঁবু ফেলেছিলুম। শীতের রৌদ্রে এক আম বাগানের ছায়ায় আমাদের বাসা। চারিদিকে অবারিত প্রান্তর, আখ আর অড়হরের চাষ, আমরা সেই শস্যক্ষেত্র পেরিয়ে নদীর তীরে তীরে চল্‌লুম পাখী শিকার করতে। সারাদিনমান কত বিচিত্র পাখীর চলাফেরা, তাদের অনেকের নাম জানিনে, কিন্তু সৃষ্টির আশ্চর্য মহিমা বুঝিতে পারি। নূতন দেশে তাঁবু ফেললেই আমরা নূতন জগতে নেমে আসি; বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের কানে কানে নূতন কথা বলে।

দেশের ভিতর দিকে যাও তাঁবু কাঁধে নিয়ে। সেখানে আমাদের জাতির সত্যকারের বাসা। সেখানে গ্রামের পর গ্রাম, তুমি তাদের মাঝখানে গিয়ে ব'সে থাকো। ছোট ছোট সমাজ, কিন্তু সবগুলোকে জড়িয়ে একটা বৃহৎ লোকযাত্রা। সেখানকার গ্রাম্য জীবনের কী সুন্দর পরিচয়। তাদের মধ্যে কত কৌতুক কাহিনী, কত রীতিনীতি, কত বিচিত্র দেশাচার, কত বিস্ময়কর সংস্কার। তাদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমরা অনেক পুরাকীর্তির কথা, রূপক গল্প, প্রাদেশিক ছড়া, প্রচলিত প্রবাদ, চাষার গান,

হাস্যকর কাহিনী, কত কাব্য ও সাহিত্যের রস আস্বাদ করতে পারি। সেখানে আমাদের ঘর নেই বটে, কিন্তু তাঁবুই হয়ে ওঠে আমাদের আনন্দের কেন্দ্র। অথচ সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জাতির অন্দর মহলের পরিচয় সংগ্রহ করে থাকি।

আবার একদিন এমন আসে যেদিন আমরা তাঁবু ফেলারও সময় পাইনে। তাঁবু সঙ্গে থাকে আর আমরা রেলের কামরায়, নৌকার ছইয়ের মধ্যে,ঘোড়ার পিঠে, জাহাজের ডেকে, উড়ো জাহাজের পাখায়,— আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন আর পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াই। সেদিন জল, স্থল আর শূন্যকে নিয়ে কল্পনায় আমরা সোনার স্বপন বুনি বটে, কিন্তু যদি কোথাও তাঁবু সেদিন ফেলতে পারি তবে পাই মধুর আরাম, মধুরতর নিদ্রা।

কোনো কাজ নেই

পলায়ন—আমার এক বন্ধুর বইয়ের নাম।

চারিটি বিভিন্ন অক্ষর, কিন্তু একত্র সম্মিলিত হয়ে ওর যে বিশ্বব্যাপী অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, হৃদয়কে ছোট করলে তাকে অনুভব করা কঠিন। পলাতক হ'লে ব্যক্তির সংজ্ঞা আসতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি—পলায়ন হলো বিস্তৃত জীবনের পটভূমি; সব কাজের শেষে পলায়ন, সকল পরিণামের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হলো পলায়ন। পলায়নের পাশেই আছে নির্লেপ, সেই কারণে পলায়ন স্বাস্থ্যকর—সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে—অস্বীকার ক'রে পালানো। দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ানো, সত্যের চেহারাকে নির্ভুল বিশ্লেষণ করা। যে জীবন দাঁড়িয়ে উঠেছে সংশয় আর নৈরাশ্যে, যার ভিত্তিতে দুঃখবাদ, যার পরিচালনায় দুর্ভোগ,—সেই জীবনকে নির্দয় নির্লিপ্ততায় বিচার ক'রে চলা,—তাকেই পলায়ন বলতে পারি। বইখানা খুলে দেখি ওর মধ্যে আর যাই থাক, ঘর ছেড়ে পালানো কিংবা কলেজ ভেঙে পালানো নেই। দেখে খুশি হলুম।

পালাবার সাধ কারো কম নয়। কেরানির বউ যেমন সব কাজের শেষে পালায় ছাদে, ইংলণ্ডের প্রধান

মন্ত্রীও পালান্ উইক-এণ্ডে। যে সব স্বামীজিরা আমাদের কর্মজীবন সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাঁহারা এক একটি উঁচুদরের পলাতক। কারণ, ভগবানকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া একটা প্রকাণ্ড পলায়ন। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। আমার চারিদিকে যা আছে তাই নিয়ে আমি খুশি নই, সুখী নই। এদের ফাঁস কাটিয়ে আরো কিছুর জন্যে আমি বেরিয়ে পড়ি। নরওয়ের সাহিত্যে একটা গল্প আছে,—নায়ক বহুধা বিভক্ত হতে চাইছে। একই মানুষ বহুরূপে প্রকাশ করছে নিজেকে। কখনো ভবঘুরে, কখনো ভিন্‌দেশী, কখনো দর্জি, কখনো ছদ্মবেশী সমাজসেবক। তার সুখ নেই, স্বস্তি নেই। যেটা গ্রহণীয় সেটাতেই তার বিরক্তি। অর্থাৎ হাতে যা আসছে, তাই সে নেড়ে চেড়ে ফেলে দেয়। আবদার ধ'রে বসে, এটা নেবো না, ওটা নেবো। কত খেল্‌না আছে সংসারে কিন্তু তার মন ভোলানো গেল না। সে একটার থেকে আর একটায় টপ্‌কে যেতে চায়, পালাতে চায় জানা থেকে অজানায়। পলায়ন তার মজ্জাগত। সে এক, কিন্তু সে বহু।

আমি ত দেখি বিপুল পলায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি কেবল স্থির, ধ্রুব। পৃথিবী বারে বারে পালাচ্ছে সূর্যকে ছেড়ে, চন্দ্র বারে বারে পালায়

পৃথিবীকে ছেড়ে। জল পালিয়ে যায় মেঘলোকে, মানুষ পালায় দেহ অতিক্রম করে। আর পশুপক্ষী? ওরা ত নিরন্তর ছুটছে,—কোথাও থেমে নেই। বীজের ভিতর প্রাণকোষ অস্থির, গর্ভের ভিতরকার শিশু মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল। চোখ চেয়ে দেখি বিশ্বপ্রকৃতির চোখে পলক পড়ে না, পর্দা উলটিয়ে দেখি, পালাবার জন্য তার অস্থির ব্যস্ততা। পাহাড়কে দেখছি স্থাণু চিরকাল, কিন্তু দুরন্ত প্রাণধারায় সে উদ্দাম।

প্রাণ এবং পলায়ন—এই দুইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আশ্বিনের নতুন চক্‌চকে আকাশ বেতারযোগে প্রাণকে খবর পাঠালো, পালাও। অমনি কন্‌সেসন টিকিটে ছুটলো চাকুরের দল, ছুটলো ট্রেন, ছুটলো মন। গয়া, কাশী, মথুরা-বৃন্দাবন, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী। শৃঙ্খল ছিঁড়ে পাখীর দল পালালো অজানায়। শরীর সারাতে নয়, মন সারাতে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চললো একটা থেকে আর একটায়; যেখানেই যায় সেখান থেকেই পালায়। অবিরাম, অশ্রান্ত ঔৎসুক্য। এর নাম পলায়ন।

ঠিক মনে নেই, বোধহয় হর্দৈ স্টেশন। পৌষের গভীর রাত। ওয়েটিং রুমে ঘুমোচ্ছিলাম। যুক্ত -

প্রদেশের উত্তর ভাগের শীতে আড়ষ্ট শরীর। একখানা ট্রেন এসে থামতেই সহসা নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ এলো। প্লাটফরমে বেরিয়ে এলাম। রাত্রির জনবিরল স্টেশন। দেখি, তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় একটি বর্ষীয়সী স্থূলকায়া স্ত্রীলোক ওলোট পালট খেয়ে গগন-বিদারী চীৎকার তুলেছে, আর একটি স্ত্রীলোক নীরবে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। দুজনেই দক্ষিণী, হরিদ্বারের ফেরৎ। খবর নিয়ে জানা গেল, আগের কোন্ এক স্টেশনে তার ছেলেটি গাড়ী থেকে নেমেছিল কৌতূহলে, কিন্তু আর ওঠেনি। বিস্ময়ের কথা এই, যে চীৎকার করছে, ছেলেটি তার সন্তান নয়; যে সান্ত্বনা দিচ্ছে সেই স্ত্রীলোকটিই পলাতকের জননী। কিন্তু প্রশ্ন হোলো, ছেলেটি গেল কোথায়? সে নেমেছিল গাড়ী ছেড়ে, আর ওঠেনি। অজানা দেশের অন্ধকারে কোন্ ঔৎসুক্য তাকে আকর্ষণ করেছে? শীত গ্রাহ্য করেনি, শৃঙ্খল মানেনি, ট্রেনের নিয়মতন্ত্রকে সে অস্বীকার করেছে—তার মন ছুটে গেছে পলায়নে। পলায়ন শব্দটা পুরুষের রক্তপ্রবাহে ভেসে বেড়ায়।

অসামাজিক মনোবৃত্তি তোমার আমার ওদের তাদের সকলের মজ্জাগত। অনেক কাল লোকসমাজে বাস ক'রে ক'রে তুমি ক্লান্ত, তুমি চাইলে স্বস্তি, তুমি চাইলে তোমার সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা

থেকে কিছুকালের মুক্তি নিয়ে পালাতে। তুমি গেলে কোনো নির্জন পাহাড়ের অধিত্যকায়, কোনো খর-বাহিনী নির্ঝরিণী তীরে, আমি গেলুম বেণুবনচ্ছায়াময় নিভৃত পল্লীর ধারে। মজ্জাগত অসামাজিক আমাদের মন। লোকনিন্দার শাসনে আর লোকচক্ষুর লজ্জায় আমরা নিয়মশৃঙ্খলাকে মানি, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রকাশ করি সেই আদিম স্বাধীন বৃত্তিকে। মানুষ আসলে জন্তু, বুদ্ধিমানদের কড়া শাসনের আবেষ্টনে সে বাঁধা—এই মাত্র। ধরো, একটা বিপ্লব দেখা গেল। দেশে পুলিশ নেই, সামরিক শক্তি নেই। জনতা যখন জানলো অন্যায় করলেও তার শাস্তি নেই,সে তখন খোলস খুলে ফেললো। অবচেতন চিত্তের যত অবরুদ্ধ বাসনা অনুকূল অবস্থায় শৃঙ্খল খুলে বেড়িয়ে পড়লো। খাঁচার তলা ভাঙলে জন্তু জানোয়ার বেরিয়ে যেমন বেপরোয়া সবাইকে আক্রমণ করে। দেশময় চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি,বলাৎকার—লোভ, ক্রোধ, হিংসা—প্রভৃতি আদিম বৃত্তির ভয়াবহ চণ্ডলীলা চললো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এর ওপর ঝোঁক নেই, এমন মানুষ কম। শিক্ষা আর সংস্কৃতির গুণে এই আদিম বৃত্তিকে কেউ সংযত করে, কেউ বা ভদ্র পোষাক পরিয়ে বা'র করে। দস্যুর হাতে এক নারী লাঞ্ছিত হ'লে তাকে আমরা বলি ইতরবৃত্তি, কিন্তু শিক্ষিত যুবক যখন

লোভে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, মাৎসর্যে একটি মেয়েকে উৎপীড়ন করে, আকর্ষণ করে, তখন আমরা তার অন্য নাম দিই। দস্যুর হাতে লাঞ্ছনা সাময়িক কিন্তু শিক্ষিত যুবকের হাতে লাঞ্ছনা যে অনির্দিষ্ট কাল অবধি চলে এবং নারীকে নির্যাতিত করে, প্রতারণা করে, নারীহৃদয়ের রক্তশোষণ করে একথা আমরা সুবিধামতো মনে রাখিনে।

কথায় কথা বাড়ে। সেদিন সংবাদপত্রের একটি খবরের কথা বলি। বিলাতের কোনো এক কারখানায় একটি ছেলে কাজ করতো। তার একটি প্রণয়িনী ছিল। ছেলেটির মনে ছিল মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে আদিম সন্দেহ। সুতরাং কারখানায় যাবার আগে সে মেয়েটিকে লোহার শিকলে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে রেখে যেতো। শারীরিক যন্ত্রণায় মেয়েটি ব'সে ব'সে কাঁদতো নীরবে। পুলিশ খবর পেয়ে এসে হাজির। তারা লোহার শিকল কেটে দিয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো, তোমার ওপর এত অত্যাচার করে, তুমি ওকে ছেড়ে যাওনা কেন ?

মেয়েটি চোখ মুছে বললে, কিছুতেই পালাতে পারিনে, জন আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

অর্থাৎ দেহের উৎপীড়নকে সে মানে না, ভালো-বাসার মধ্যেই সে পায় স্বচ্ছন্দ জীবন, সেখানে তার মুক্তি, সেখানেই স্বাধীনতা—পালাবার দরকার তার

নেই। বাঁধনকে তখনই বাঁধন ব'লে মনে হয় না, যতক্ষণ প্রাণের মধ্যে থাকে স্বচ্ছন্দ আনন্দ। আমাদের সমাজে শাসন আছে, সন্দেহ আছে, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উৎপীড়ন আছে,—কিন্তু মমত্ববোধ নেই। বর্তমান জীবন তার প্রসার খুঁজতে চাইছে, ব্যাপ্তির মধ্যে সে চাইছে বিস্তৃত স্বাধীনতা, কিন্তু তার পথ নেই। কোথাও কোনো অন্যায় ঘটেছে, কোনো সম্ভ্রান্ত নারীর সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, জননীত্ব গোপন করার জন্য কোনো নারীর অপমৃত্যু ঘটেছে,—অমনি আর রক্ষা নেই। বড় বড় হরপে সেই তথাকথিত দুর্নীতির খবর ছেপে দরজায় দরজায় হাতে হাতে বিক্রি। এমন নির্লজ্জ কলঙ্ক-বিক্রয় কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব।

জানি এর উল্‌টো কথাটাও আছে। নারীধর্মের উপর সমাজ-জীবনের ভিত্তি,—অবিবাহিতার জননী হবার অধিকার আজো সভ্যজগতের সমাজপতিরা স্বীকার করেনি। সমাজ এক বস্তু, চিত্ত রহস্য ভিন্ন বস্তু। একটা অন্যটার প্রতিবাদ। পৃথিবীতে যাঁরা বরেণ্য, তাঁদের সকলেই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু অনেকেই চরিত্র শুচিতার পরিচয় দেননি। প্রতিভা দৈব, স্বভাব-ধর্ম মানবিক। একটি মেয়ের নৈতিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ হ'লেও প্রতিভার পরিচয় সে দিতে পারে। পৃথিবীতে এমন বহু মেয়ে পাওয়া গেছে যাঁরা তথাকথিত সতীত্বকে

মানেননি, কিন্তু শিক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে, চারুকলায় এবং নৃত্যগীতে তাঁরা অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষের কথাও তাই। পুরুষ স্রষ্টা, পুরুষ নিত্য পৃথিবীকে সৃষ্টি ক'রে চলেছে, প্রত্যেকটি পুরুষের মধ্যে রয়েছে রক্তগত সৃজনপ্রতিভা,—নৈতিক চরিত্র তার কাছে প্রধান কথা নয়। পুরুষের আলোচনায় প্রতিভার কথাই ওঠে, নৈতিক চরিত্রের আলোচনা তার কাছে হাস্যকর, ওটায় সে বিরক্তি বোধ করে।

কিন্তু পলায়ন কা'কে বল্‌বো?

কলেজ-পালিয়ে ছাত্ররা যায় বনভোজনে, কেরানি আপিস পালায়, তরুণী ঘর ছেড়ে পলায় যুবকের কোঁচার খুঁট ধরে, রাষ্ট্রবিপ্লবে জনসাধারণ পালায় রাজধানী ছেড়ে, দরিদ্র আত্মহত্যা ক'রে দারিদ্র্য থেকে পালায়, কয়েদী পালায় জেল থেকে, বাপের শাসন থেকে ছেলে পালায়, স্ত্রীর উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নিয়ে পালায় নির্বোধ স্বামী। কিন্তু পলায়ন কোন্‌টা?

মুসৌরী পাহাড় পেরিয়ে কেম্‌টি জলপ্রপাতের পথে নিজের মনে চলেছি। হেমন্তকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ আর মেঘ ঝলমল করছে। দূরে 'ক্যামেল্‌স্‌' ব্যাক্‌ ধীরে ধীরে পথের বাঁকে মিলিয়ে

গেল। উত্তর দিকে দিগন্ত সীমানায় চিরতুষার শুভ্র হিমালয়-কীরিট। এদিকে ম্যালের পথ কেম্‌টির বাঁকে এসে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

অন্তর্নিহিত মুক্তির আর স্বাধীনতার পিপাসা না থাকলে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়; নিজের দুই পায়ে চলার পথটুকু অতি সঙ্কীর্ণ সবাই জানে, কিন্তু আমার সেই পদচিহ্ন পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে কুটুম্বিতা না করলে পর্যটন সার্থক নয়। তাই ভ্রমণের অপর নাম দিলুম পলায়ন। যা কোনোকালে জানতে পারিনি, আমার বোধের মধ্যে যার চেতনা নেই, চিরকাল ধ'রে দুর্জ্ঞেয় আর দুর্গম—তার পিছু পিছু ছুটে চলাকে কি বলবো? ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা পথে-বিপথে বেড়িয়ে পড়ে, যে সিদ্ধার্থ পালায় নিদ্রিতা প্রিয়তমার শয্যা ছেড়ে অন্ধকার রাত্রে, জনজীবনের কল্যাণে যে-টলষ্টয় পথে বেরিয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হবার আনন্দে, যে-দুঃসাহসী অভিযান করে দক্ষিণ মেরুপথে, শ্রাবণের দুর্যোগে যে চিররাধিকা চির-ঘনশ্যামের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করে, তাকে কি বলবো?

অসন্তোষ আর জিজ্ঞাসা, পলায়নের মূলমন্ত্র। অল্পে সুখ নেই, বহু বিদ্যায় তৃপ্তি নেই,—এমন মানুষ যখন বেড়িয়ে পড়ে বড় কিছুর জন্যে, মহৎ কিছুর

আশায়, তখন বুঝতে পারি মানুষের মানে। অসাধারণ তার প্রতিভা যে পালাতে জানে; অসামান্য তার শক্তি, যে হারাতে জানে।

মুসৌরী পেরিয়ে কেম্‌টির পথে যেতে যেতে এই কথাই ভাবছিলুম।

অরণ্য

অরণ্যভূমি ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ ও প্রাচীন সংস্কৃতির জন্ম অরণ্য-তপোবনে, এবং অরণ্যভূমি সম্বন্ধে কিছু না জানলে আমাদের দেশকে জানা অনেকখানি বাকি থেকে যায়। আমি যদি এমন কথা বলি, ভারতবর্ষে প্রতি তিনশত বর্গ-মাইলের মধ্যে এক একটি বিশাল অরণ্য দেখা যায় তাহ'লে আশাকরি শহরবাসীরা বিস্মিত হবেন না। ভারতবর্ষের রহস্যলোক বহু ভারতবাসীর কাছেই অজ্ঞাত।

সুন্দরবন, টিরাই, মধ্যপ্রদেশ, কাংড়া, আসাম—এই সব জঙ্গলের আলোচনা অল্পসময়ের মধ্যে হয় না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার নিকটবর্তী স্থানে যে বিশাল পার্বত্য অরণ্যভূমি অবস্থিত অনেকেই সে কথা জানেন। এই অরণ্যের বিস্তৃতি অতি ব্যাপক, এই ভূভাগে যে কয়েকটি নগর বিখ্যাত তাদের মধ্যে কোডারমা, গোমো, বড়-কাকানা, হাজারিবাগ, পরেশনাথ, রাঁচি, গয়া, রাজগৃহ—প্রভৃতি সকলেরই পরিচিত। কিন্তু মোটরে বা ট্রেনে ভ্রমণকালে আমরা সাধারণত যে সব বনজঙ্গল দেখি, সুরক্ষিত গাড়ীর মধ্যে বসে যে সব চটকদার

বাঘ-ভাল্লুকের গল্প শুনি—সত্যকার পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করলে আমাদের অনেক ধারণা বদলায়। যারা জন্তু শিকার করবার জন্য জঙ্গলে ঢুকে বাঘ মেরে এনে খবরের কাগজে নাম ছাপায় তারা হাততালি পায় বটে কিন্তু অরণ্যলোক তাদের কাছে অন্ধকারই থেকে যায়। অরণ্য তাদের চোখে আনন্দের তপোবন নয়, হিংসা পরিতৃপ্তির একটা রণস্থল মাত্র। নিরস্ত্র এবং অহিংস মন নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলে তবেই অরণ্য-ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া যায়।

অত্যন্ত গভীর যে সকল বনভূমি আছে সেখানেও দেখা যায় মানুষের বাসা। তারা জংলী, সভ্যতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। সামান্য চাষ-আবাদ করে, বর্শা-বল্লম-তীর-ধনুক নিয়ে জন্তু-শিকার করে, কাঠ কাটে, চামড়া বিক্রী করে। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তারা পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে চলে। আর এক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় তারা আরণ্যক, তাদের কোথাও স্থায়ী বসতি নেই। যেখানে-সেখানে পাতার ঘর বেঁধে মজুরি ক'রে তারা চালায়। অসতর্ক অবস্থায় জানোয়ারের কবলেও তারা প্রাণ হারায়।

বিহার প্রদেশের কয়েকটি বনভূমি আমি দেখেছি। এই অরণ্য একটির থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন নয়, কেবল

নামের তফাৎ মাত্র। গোমো ও হাজারিবাগ থেকে যে অরণ্যের আরম্ভ, সেই অরণ্যই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের সীমা ও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের দিকে চ'লে গেছে। ভারতবর্ষের সকল অরণ্যই প্রায় সমগোত্রীয়, তবে বৃষ্টিপাত ও নদীবাহুল্য যেদিকে বেশি, যেমন আসাম ও সুন্দরবন—সেদিকে ভ্রমণের অনেক সময়ে বিশেষ অসুবিধা। সুন্দরবনের সর্পভয় ও অন্যান্য সরীসৃপের আতঙ্ক বিহারের বনভূমিতে কম। আবার বিহারের জঙ্গলের জল-বাতাস যেমন ভালো এমন আসাম অথবা সুন্দরবনে নেই।

পরেশনাথ পাহাড় বাংলা দেশের নিকটেই, কিন্তু ওই সামান্য চার হাজার ফুট পাহাড় ও উপত্যকাকে ঘিরে প্রকৃতির যে অপূর্ব সৌন্দর্য তার তুলনা বড় কম। যাঁরা অধুনালুপ্ত ইস্‌রি স্টেশন থেকে নেমে পশ্চিম দিক ঘুরে পরেশনাথ পর্বত আরোহণ করেছেন তাঁরা জানেন, এদিকে গভীর শাল ইত্যাদির জঙ্গল। আগে এই সকল পথ খুবই দুর্গম ছিল কিন্তু ইদানীং শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দলের কৃপায় পথ-ঘাট চলনসই হয়ে উঠেছে। পরেশ-নাথের পার্বত্য অরণ্য বহুদিকে বিস্তৃত—অর্থাৎ নিমিয়া ঘাটের দিক থেকে উশ্রী ও গিরিডি অবধি। এই পরেশনাথের অরণ্যদৃশ্য অতি মনোরম, অরণ্য অতিক্রম করে বহু ভ্রমণকারী চূড়ার উপরে উঠে মন্দির দর্শন

করতে যান। সন্ধ্যার দিকে মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরেশনাথের পাদদেশে মাড়োয়ারির ধর্মশালায় ব'সে প্রায়ই রাত্রে সত্য সত্যই বাঘের গর্জন কানে আসে।

হাজারিবাগের পথ দিয়ে রাঁচি যাবার দিকে বহু জঙ্গল দেখা যায়। শালের জঙ্গলই বেশী। শিকারীরা এই পথের দুধারে আগে জন্তু শিকার করতো। বন্য শূকর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শম্ভর, নীলগাই প্রভৃতি এখনো প্রচুর আছে কিন্তু তারা আগেকার মতো মোটর পথের ধারে আর সহসা আসে না, প্রাণ দিয়ে দিয়ে তারা চতুর হয়ে গেছে।

গয়া জেলার জঙ্গল বিহারে বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার অরণ্য পার্বত্যময়, সেইজন্য প্রায়ই দুর্গম। রাজগৃহ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা, তার সঙ্গে ছোট ছোট নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, গুহাগহ্বর,—অথচ মানুষের বসতি কম। এদিকে নানাভাগে শত শত মাইল জঙ্গল। যে সকল কেন্দ্রগুলি শিকারীর নিকট বিশেষ পরিচিত তাদের মধ্যে কাহুডাক, রজৌলী, একতারা, জনকপুর, মহাদেবপুর ইত্যাদি বিখ্যাত। আমি দু'চারটির কথা বলতে পারবো। পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য, বাইরের দিকে অল্প-স্বল্প দেখা যায় বটে কিন্তু অন্দর মহলে প্রবেশ করা যায় না। এমন অবস্থায় 'শব্দহীন'

মোটর যোগে ভ্রমণ করাই বিধি। বন্দুক সঙ্গে রাখা দরকার কিন্তু যতদূর সম্ভব সংযম পালন করা উচিৎ। মোটরে চ'ড়ে শিকার করতে যাওয়া মানেই হত্যার নেশা। হত্যার উদ্দেশ্যে গেলেই সমস্ত অরণ্যলোক আতঙ্কে যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, এবং তা'তে ফল এই হয় যে, অরণ্যভ্রমণের আনন্দ অনেকটা ব্যাহত হয়। একটা বন্দুকের আওয়াজ হলেই সমস্ত অরণ্য স্তব্ধ ও অসাড় হয়ে যায়, জীবজন্তুরা সতর্ক হয়ে আত্মগোপন করে। কাহুডাক, একতারা প্রভৃতি জঙ্গলে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি। অরণ্যে প্রবেশ করতে হয় অতি নিঃশব্দে আত্মগোপন ক'রে—যদি নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাকেও চেপে রাখা যায় সে চেষ্টাও করা উচিৎ। কথাবার্তা, সিগারেট-জ্বালানো, মোটরের কোনরূপ সাড়াশব্দ—অর্থাৎ এমন কোনো সামান্য অশান্তি, যাতে অরণ্যের ঘুম ভেঙে যায়, সেই কাজ করা চলবে না। সাধারণত জঙ্গলে গিয়ে একথা মনে করা স্বাভাবিক যে, চারিদিকে কোথাও জীবজন্তু নেই, বেশ নিরিবিলি। কিন্তু সেটা ভুল, অতি নিকটেই চারিদিকে সব কিছুরই অস্তিত্ব আছে, আমরা কেবল চোখে দেখতে পাইনে। মানুষের অপেক্ষা তাদের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল, দৃষ্টি ও চৈতন্য অতি সজাগ, আনাগোনা অতি নিঃশব্দ ও গোপন। সেইজন্য জঙ্গলের মধ্যে অনাত্মীয় কোনো মানুষ পদার্পণ

করলেই তাদের জগতে নিঃশব্দে একটা সাড়া প'ড়ে যায়, তারা সতর্ক হয়ে একটা ব্যবধানের আড়ালে চ'লে যেতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, নরখাদক ব্যাঘ্র অথবা বন্যশূকর সহসা নোটিশ না দিয়েই অতর্কিত অবস্থায় ছুটে এসে আক্রমণ করে, কিম্বা দেখা যায় দূরে কোথাও একটা গর্জন শোনামাত্র সমস্ত অরণ্য নিঃসাড় হয়ে যায়। তারপর বহু চেষ্টা করেও আর কোনো জন্তু জানোয়ারের দর্শন মেলে না।

সকল বনভূমিই সকল সময়ে জীবজন্তু ও সরীসৃপে পরিপূর্ণ। অরণ্যই তাদের নিরাপদ আশ্রয়, অরণ্য-স্বভাবের সঙ্গে তারা জীবযাত্রার সুর মিলিয়ে জীবন-ধারণ করে। অদ্ভুত পাখীর দল গাছে গাছে, বানর ও হনুমানের প্রকাণ্ড উপনিবেশ, নামহারা সব অতিকায় সরীসৃপ, কোটরে কোটরে বিষাক্ত রঙীন সাপ, বিচিত্র পিপীলিকা ও পতঙ্গ, ভয়ঙ্কর নামহারা কীটের দল,—জীবজন্তুতে সকল সময় জঙ্গল ঠাসা। এক এক সময় দেখা যায়, কোনো এক জঙ্গলে কোনো প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। তখন বুঝতে হবে এটা বাঘের জঙ্গল। কারণ বাঘ এতই হিংস্র যে, তার নিকটবর্তী সকল জঙ্গলেই অন্য প্রাণী নিরাপদ নয়। খরগোস, হরিণ, হায়না, শূকর, শম্ভর, এমন কি

শৃগাল ও বনকুকুর অবধি সে-রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পালায়। বাঘের স্বভাব রাজোচিত। ভিতরে যতই হিংস্র, উপরে ততই যেন উদাসীন। সাম্রাজ্যবাদীর মতো অহঙ্কারে ও আভিজাত্যে সর্বদাই সে নতমস্তক। অন্তরে সে ভয়ানক চতুর, সন্দিগ্ধ, লোভী, কুটীল —কিন্তু বাইরে সে নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, মৃদু-মন্থর, চোখ দুটো তপস্যায় যেন নিমীলিত। তার আবির্ভাবে সমগ্র বনস্পতি যেন ভয়ে আড়ষ্ট। হঠাৎ একটু অপ্রাকৃত আওয়াজ, অমনি বাঘের ঘুম ভাঙে। মুখ তুলে সে তাকায় অরণ্যদেবতার দিকে, যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ মনে জাগে অমনি অন্যপথে চলতে থাকে। কেবল ল্যাজের একটি ঝাপট দিয়ে গুরু গুরু পদভরে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে চলে যায়।

শুক্লপক্ষের রাত্রে খাকি পোষাক প'রে অরণ্যে প্রবেশ করা উচিৎ। নিজেকে কোনো রকমেই সুস্পষ্ট করা চলবে না। জঙ্গলের গাছপালা, লতা পাতা সকলের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একাকার ক'রে দিতে না পারলে কিছু জানা যায় না। আমরা যখন অমাবস্যার রাত্রে জনকপুর জঙ্গলে প্রবেশ করলুম, আমাদের প্রাণ-চৈতন্যকে অতি নিবিড়ভাবে অনুভব করছিলুম। চারিদিকে যেন প্রকাণ্ড এক পরিবার, আমরা তাদের মাঝখানে বিদেশী অতিথি। প্রবেশ করবার আগে অন্তরে একটি আতঙ্ক ছিল, কিন্তু সেই গভীর তপস্যা-লোকে প্রবেশ ক'রে একটি নিগূঢ়

আনন্দ ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে উঠছে। অরণ্যের জটিল জটায় আর শিকড়ে শিকড়ে যেন একটি সুপ্রাচীন ভাষা শোনা যায়। গাছের কোটরে, রন্ধ্রে, পত্রপল্লবে, কীটদলের কেমন করকরানি, পাখীর তন্দ্রা-ভাঙার শব্দ, সাপের বুকে-হাঁটার আওয়াজ, জন্তুর নিশ্বাস, খরগোস ও শৃগালের চলাফেরা, বাদুড়ের ঝাপটা, বাঘের ঘুপঘুপ শব্দ,—এদের সঙ্গে যেন সব প্রেত-লোকের ছায়াচারীদের নিঃশব্দ চলা-ফেরা। যেন কোথায় অন্ধকারে একটা বিরাট উৎসব চলছে, সবাই যেন সেই উৎসবের চারিধারে সমবেত। চোখ বুজে থাকা আর চোখ খুলে রাখা একই কথা, একই অন্ধকার। নিশ্বাস রোধ ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াও। সহসা দ্রুত লঘু পদশব্দ। চারিদিক থেকে কয়েকটা বনকুকুর ছুটে গেল। তারপর অনেক দূরে শোনা গেল আহত হরিণের আর্ত-নাদ, সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো ব্যাঘ্রের একটা নাসাগর্জন, ভালুকের ডাক—অরণ্যের ধ্যান চুরমার হয়ে গেল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, নিরপরাধ হরিণকে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। বনকুকুর কয়েকটা হরিণকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করেছে। বাঘ জানতে পেরেছে কিন্তু কুকুরের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিজে আত্মসাৎ করতে না পেরে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ভালুক আওয়াজ দিয়ে তার ভয়ানক ক্ষুধা জানিয়ে

দিলে। চতুর চিতাবাঘ ওৎ পেতে পেতে কুকুরের কবল থেকে হরিণকে নিয়ে পালাবার আয়োজন করছে।

এমন মুহূর্তে তুমি সহসা স্পট্ লাইট ফেলে চেয়ে দেখো অরণ্যের রূপ। অন্ধকারের গভীরতা ভেদ ক'রে তোমার তীব্র টর্চের আলোও বেশিদূর যেতে পারবেনা। চেয়ে দেখো জটাজুটধারী ঋষি বনস্পতি তাঁর বীজমন্ত্রে সমস্ত শ্বাপদ-কুলকে বশীভূত করেছেন। তোমার টর্চের আলোয় অভিভূত সহস্র সহস্র জীবজন্তুর চক্ষু, আলোর তীব্রতায় সহসা তাদের চক্ষে ধাঁধাঁ লেগেছে। কোনো চক্ষু নীল, কোনোটা কপিশ, কোনোটা হরিদ্রাভ, কোনোটা বা শ্বেতাভ কৃষ্ণ। কিন্তু ওদের মধ্যে যে-দৃষ্টি উজ্জ্বল লোহিতবরণ—তিনিই হলেন স্বয়ং শার্দূলরাজ। তোমার আলোকমন্ত্রে সবাই স্তব্ধ, তুমি সেই মুহূর্তে অরণ্যের হিংস্রতা আর অরণ্যের তপস্যা-নিমীলিত-সৌন্দর্য দেখে নাও। তারপর কারুকে হত্যা না ক'রে আলো নিবিয়ে সাবধানে নিঃশব্দে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চ'লে যাও।

শোবার ঘর

শোবার ঘরে বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। আমি পছন্দ করিনে আমার অনুপস্থিতিতে আর কেউ—যার সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ নেই, এমন একজন কেউ আমার ঘরে এসে সময় কাটায়। ঘরে আমার টাকা নেই, সোনা নেই, দামী পোষাক নেই, অথচ এমন কিছু আছে যা একান্ত নিজস্ব। আমার পরিচয়টা আছে সমস্ত ঘরময় ছড়ানো, আর কেউ সেখানে এসে দাঁড়ালে চমকে উঠি, ভয়ে আড়ষ্ট হই, লজ্জায় ঘরখানাকে ঢেকে রাখতে চাই। আমার বহুকালের অসংলগ্ন চিন্তা, উদ্ভট কল্পনা, অসম্ভব স্বপ্ন—সমস্তগুলো শোবার ঘরের সর্বত্র যেন চিত্রিত হয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গতিও নেই, সামঞ্জস্যও নেই। অসতর্ক মুহূর্তে বাইরের মানুষ হঠাৎ ঢুকে যদি তাদের দেখতে পায়?

টেবলটা অবশ্য বড়, এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটা পিঁপড়ে হেঁটে যেতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগে। কতকগুলো অনাবশ্যক চিঠিপত্র—সেগুলোর মধ্যে কাজের কথা কম আছে, অথচ অনর্থক উত্তর চায় পদে পদে। খানকয়েক মাত্র বই—শ'দুইয়ের বেশী নয়—সে-গুলো ঘরময় এখানে ওখানে ছড়ানো। একখানা ভাল

মনে-মনে

বই পড়তে আমার একমাস লাগে। আলমারির মাথায় আমার এক শিল্পীবন্ধুর উপহার দেওয়া একখানা স্ত্রীলোকের ছবি। ডুরে-শাড়ী-পরা, বোকা বোকা চোখে চাওয়া একটি মেয়ে; মাথায় অল্প ঘোমটা, হাতে একগাছা চুড়ি,—মুখের উপরে হৃদয়বৃত্তির কোনো ছাপ নেই, বরং নাকের গোড়ায় আর চিবুকে যেন একটি অস্পষ্ট অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু বসবার ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা শান্তশ্রী। আর একটি জলাভূমির চিত্র। বন্যায় চারিদিক ভেসে গেছে, একটি ছোট কুটির আত্ম-রক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জল, আকাশ, মাঠ সব একাকার। জনমানব নেই। ভরা বর্ষার এমন একটি স্বপ্ন চিত্রে রূপান্তরিত। পনেরো বছর আগে এক বাল্যবন্ধুর কাছে উপহার পাওয়া,—যে বাল্যবন্ধুটির সঙ্গে আমার কোনো দিন মতের আর পথের মিল হয় নি। মিল হয়নি বটে কিন্তু মনোমালিন্যও হয় নি। দুজনে দুজনকে দেখলে যেন মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠতাম। গলাগলি এবং গালাগালি কিছুতেই ত্রুটি নেই। গোপনে ধূমপান করা, বিনা টিকেটে স্টীমারে চড়া, ইস্কুল পালিয়ে ডায়মণ্ড হারবার যাওয়া, সাইকেলে গড়ের মাঠে খেলা দেখতে ছোটা,—এমন সঙ্গী আর আমার দ্বিতীয় ছিল না। পথে পথে দুজনে বিবাদ করেছি, প্রহার বিনিময় হয়ে গেছে, কিন্তু দুদিন দেখা না হ'লে দুজনেই উদ্বিগ্ন হতুম।

দেয়ালে দুখানা ক্যালেণ্ডার, আমেরিকান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবি, একটি আমার ফটো, ব্রাকেটে একটি টাইমপিস ঘড়ি। তেলের শিশি, বোরিক তুলো, ব্রাউনী ক্যামেরা, কালির দোয়াত, পেপার-ওয়েট, টেব্‌ল-ল্যাম্প। ভাঙা এসরাজটা আজো আমার ঘর ছাড়েনি, তার ছেঁড়া তারে আর সুর ওঠে না। আলমারির মাথায় যত রাজ্যের অকেজো জিনিস। একতাল দড়ি,—গলায় দেবার দড়ির চেয়ে সরু; খালি ওষুধের কয়েকটা শিশি, একটা ছোট মেরিনার্স কম্‌পাস, একগাছা রুল, পুরাণো একখানা নোট বই, ক্যারমের কয়েকটা ঘুঁটি, মলাট-ছেঁড়া একখানা এডগার ওয়ালেসের বাজে গল্পের বই। তিনটে চামড়ার ব্যাগ আমার শোবার ঘরে। যতই কেন না গৃহস্থের শান্ত জীবন যাপন করি, এই চামড়ার ব্যাগ তিনটে আমাকে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দেয়,—তুমি ঘরের নয়, বাহিরের। কেন এসেছ জনতায়? কেন লোকালয়ে? তিনটে চামড়ার ব্যাগ! কিন্তু ইতিহাস অনেক। শিমলা পাহাড়ের সেই লক্ষ্মীনিবাসের ছোট ঘর, রাওয়াল-পিণ্ডির পাঞ্জাবী হোটেল, দ্বারকানাথের ধর্মশালা, মাদ্রাজের পরমানন্দ ছত্রম্, দার্জিলিঙের জলাপাহাড়ের মাটি, শীলঙের হিন্দু হোটেল—সব জায়গায় দাগ, সব ধর্ম-শালার ধূলো, সকল ভ্রমণ কাহিনীর একটা চর্মতালিকা।

চারটে ফাউন্টেন পেন্। 'ঝরণা-কলম' আমি এদের বলতে পারবো না। নামটার মধ্যে একটা অর্থ পাই কিন্তু রস পাইনে। কোথায় কোন্ দূর অরণ্যময় পর্বত, গোপন-চারিণী ঝরণা, আর কোথায় মণিহারি দোকান থেকে কেনা একটা কলম—ছুটো শব্দের এমন একটা অসঙ্গত গোঁজামিল আমি পছন্দ করিনে। মুনির তপোবনে একটা যেন সদ্য আবিষ্কৃত রিভলভার। মনে করেছিলুম কবিঠাকুরের কাছে একখানা প্রতিবাদ পত্র পাঠাবো, তার নকলও রয়েছে আমার টেবলে প্যাডের তলায়,—কিন্তু পাঠাতে সাহস করি নি। চারটে ফাউন্টেন পেন্ আমার। এক একটা কলমের খোঁচায় কত মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়,—কেউ মরে, কেউ পালায়, কেউ হয় প্রণয়াসক্ত, কেউ দেয় বক্তৃতা। কলমের কালি যখন ফুরোয় তখন লিখি চোখের জলে, লিখি বুকের রক্তে। আমার ঘরে এসে কেউ আমার কলম ছোঁয় আমি পছন্দ করিনে,—কলম একান্ত আমার, তাদের ভাষা আছে, সম্ভ্রম আছে, শুচিতা আর আভিজাত্য আছে।

আমার শোবার ঘর বালীগঞ্জী বড়লোকের নকল নয়। চীনে বাজারের রংচঙে পরদা দিয়ে আমি ঘরের দারিদ্র্য গোপন করিনে। বন্ধুদের সাজানো ঘরে উঁকি দিয়ে এসে আমি সুলভ আভিজাত্যের ঢঙে ঘর

সাজাইনে ; আমার ঘরের দারিদ্র্যই আমার অহঙ্কার। নকল পোষাকপরা যাত্রার রাজা সাজার চেয়ে আসল মানুষটার অনেক দাম। আমার ঘরে জঞ্জাল আছে কিন্তু নোংরা নেই। ছেঁড়া কাগজ, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, পুরনো মাসিকপত্র, নিমন্ত্রণের চিঠি, সিগারেটের কুচি, কাটা প্রুফের কাগজ, প্যাকেট খোলা মলাট, দাড়া ভাঙ্গা চিরুণী, খালি এসেন্সের শিশি, বাসি ফুল —এগুলো অবশ্য নোংরা নয়। একরাশ দড়ি, দুখানা বড় ছুরি, দুটো নরুণ, তিনখানা কাঁচি, চারটে লাঠি— অর্থাৎ, এই সব সজ্জা আমার ভালো লাগে। ঘরে অস্ত্রশস্ত্র থাকলে আমি খুশি থাকি। অস্ত্রের উপর আমার লোভ। বড় লাঠিটা এনেছিলুম হিমালয় থেকে, চেরীর লাঠিটা পেয়েছিলুম দার্জিলিঙে, তেড়াবাঁকা লাঠিটা শিমলা পাহাড়ের,—আর চতুর্থটা পাটনার দাদুর দেওয়া। একখানা বড় তলোয়ার ছিল— পুলিশের ভয়ে সেখানা নষ্ট করেছি। মনে করেছিলুম বাংলা দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকরা যেদিন কলেজ স্ট্রীট আর কর্ণওয়ালিসের রাস্তায় অন্নের অভাবে রক্তাক্ত বিপ্লবে মেতে উঠবে, আমি আমার তরবারি নিয়ে তাদের সেই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করবো। কিন্তু সেটা বুঝি আর সম্ভব হোলো না। তারা কো-এডুকেশনের নেশায় ডুবে রইলো। তাদের রক্তে নুনের চেয়ে চিনির

ভাগ বেড়ে গেছে। ছাত্র ও যুবকদের জন্য আমি একটা আবেদনের খসড়া করেছিলুম, হয়ত সেটা আজো আছে আমার ঘরের জঞ্জালের মধ্যে,—সেখানা আগুনের অক্ষরে লেখা; গান্ধীজীর অহিংসাবাদের অপেক্ষাও উত্তেজক।

কুটি কুটি টুকরো লেখা আমার শোবার ঘরে ছড়ানো; ভয় করে পাছে সেই টুকরোগুলো কারো চোখে পড়ে। কয়েকটা টুকরো খুঁজে পাওয়া গেল।

‘অন্যায় করার অধিকার সকলের নেই, যারা করে তারা পৃথিবীতে বড় হ’য়ে জন্মায়।’

‘বাঙলা দেশ অরাজক তার কারণ আমাকে আজো ফাঁসীকাষ্ঠে ঝোলানো হয়নি।’

‘যে দেশে সতীনারীর সংখ্যা বেশি সেই দেশেই কেবল মেয়ে চুরি হয়।’

‘পাগল বললে, তুমি পুতুল, সৃষ্টিকর্তা নাচিয়ে বেড়ায় তোমাদের সকলকে।’

‘সাহিত্যের নীতি নিয়ে রামদাস মোদক মাথা ঘামিয়ে ম’রে গেল, তার বাড়ী ছিল বটতলায়।’ ‘কেন তুমি এমন ক’রে চ’লে গেলে? কেন মরলে না চার বছর আগে—যখন সত্যিই তোমার মৃত্যু কামনা করেছিলুম? যেদিন তোমাকে বাঁচাতে চাইলুম সেইদিন দিলে ফাঁকি?’

এমন অনেক কাগজের টুকরো। এর পরে দেখা গেল উইপোকার বাসা আমার ঘরময়। ছুটো টিকটিকি দেখা দেয় রাত্রের ঘরের আলোয়, তারা পোষমানা নয়, কিন্তু পরিচিত। আসে আরসোলার লোভে। আবার দেখি শরৎকালের নীল শূন্যপথ থেকে ছট্‌কে আসে এক একটা বোলতা,—কামড়ায় না, কেবল ছুঁয়ে যায়। জানলা দিয়ে রোদ আসে, সেই আলোয় রঙিন সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল দেখতে পাই, টেবলের কোণা থেকে জানলার গরাদ পর্যন্ত অদৃশ্য মায়াজাল সেতুর মতো রচনা করেছে।

মানুষের জীবন এমনি। কোথা থেকে কোথায় যে কার সঙ্গে মায়াজাল রচনা করেছি, হয়ত নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারিনে। জাল অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য। সেই জাল যখন মহাকালের হাতে ছিন্ন হয় তখন জানি, বেদনার গভীরতা। মরণ যেদিন আসে সেইদিন বেশি ক'রে বাঁচতে চাই। রণদামামায় উত্তেজিত হয়ে সৈন্য ছুটে যায় যুদ্ধে, মারতে আর মরতে,—জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—কিন্তু আহত হয়ে কাঁদে, বলে, জল দাও, সেবা করো, বাঁচাও।

শোবার ঘরে তিনখানা কড়িকাঠের দিকে চেয়ে অনেক সময়ে ভেবেছি, কেন বাঁচবো? কোন্ অধিকারে?

জীবনকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করলুম কই? সর্বসংস্কার-মুক্ত কি হওয়া যায় না? ঘরের মধ্যে জঞ্জাল মাড়িয়ে পায়চারি করলাম তেরো বৎসর ধরে। হিসেব ক'রে দেখো, শত শত মাইল পথ জট পাকিয়ে মৃত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। আমার অতীত। আমার অভিশপ্ত নিরানন্দ অতীত। পা বাড়াবো কোন্ দিকে? অতীত আমার পথরোধ করে। ওদের মুকুরে দেখি আমার প্রতিফলিত রূপ। দেখে ভয় পাই। আমার হাতে শাসনভার থাকলে নিজেকে গুলী করে মারতুম।

কিন্তু চমৎকার আমার শোবার ঘর। যেন বিংশ শতাব্দীর চিতাশয্যা। আমার নিঃশ্বাস লেগে লেগে দেয়ালে নোনা ধরেছে, আমার নখের আঁচড়ে কড়িকাঠ-গুলো ক্ষয় হয়েছে, উইপোকার জটিল পথ আমার চিন্তার সাক্ষী।

আশ্চর্য, 'হঠাৎ সেদিন দিল্লী থেকে ফিরে দেখি আমার ঘরখানা ছোট হয়ে গেছে। দরজায় মাথা গলে না, জানলাগুলো ক্ষুদ্র। আমার চিরপরিচিত শোবার ঘর এত ছোট? তবে কি বাইরে গিয়ে বড় হয়ে এলুম? আর কিছু চিনতে পারিনে, সব যেন নতুন লাগে। বিদেশী যেন হঠাৎ এসে পড়েছি, কিছুই আমার ব'লে মনে হয় না। কেন? কেন এই মনোবিকার? তবে



মনে-মনে

কি হৃদয়বৃত্তি আমার কিছু নেই? যাকে ফেলে যাই তাকে ভুলে যাই?

আবার ঘর বড় হয়, আমি ছোট হই। দেখি বই-গুলো ঠিক আছে, মোটা মোটা গ্রন্থাবলী। যে-বইখানা সকলের চেয়ে বড়, সকলের অপেক্ষা বিরাট, সেই বই-খানাই অগোছালো। আমার এই সুন্দর শোবার ঘরে আমি নিজে সেই অসমাপ্ত বিরাট গ্রন্থ।